আর এক উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

প্রীতিভাজনেষু

এই বইটিতে দুটি উপন্যাস আছে। শেষেরটি 'বিশ্ব ও বিন্দু' অনেকদিন আগে আর একবার প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকদের একান্ত অনুরোধে এটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হ'ল।

আর এক উপন্যাস

'দুর্গেশনন্দিনী'র নায়ক ওসমান খাঁকে বাঙালী সাহিত্যপাঠক কে না জানেন।

কিন্তু বঙ্কিমবাবু অমন একটি লোকের অকালমৃত্যু ঘটিয়েছেন।

বস্তুত ওসমানই সর্বাংশে নায়ক হবার যোগ্য পুরুষ. তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মিলন কাহিনী দিয়ে উপন্যাস শেষ করেছেন।

ওসমানকে ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকদের অনুমানের ভরসায়। কৎলু খাঁর মৃত্যুর পর ওদিকের খবর আর বিশেষ দেন নি।

বঙ্কিমের ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বেয়াই দামোদর মুখুজ্জে মশাই।

তবে তাঁর অন্য প্রচেষ্টার মতোই এও 'সাধনোচিত' ধামে গমন করেছে—অর্থাৎ সে সব বইয়ের নামও কেউ জানে না। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী প্রভৃতি অনেক বইয়েরই তিনি উপসংহার-গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ বাঙালী পাঠক সে অযাচিত উপকারকে আমল দেয় নি।

হয়ত খুঁজলে প্রাচীন কোন পাঠাগারে এক আধ কপি মিলতে পারে।

যাই হোক—বঙ্কিমবাবু ওসমানকে উড়িয়ে দিলেও ইতিহাস দেয় নি।

ইতিহাসে ওসমানের কথা আরও অনেক আছে। সে কথাটা আগে সেরে নিই।

কৎলু খাঁর মৃত্যুতে উড়িষ্যার পাঠান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তারা ওখান থেকে প্রথম পূর্ববঙ্গে ঘাঁটি গাড়বার চেষ্টা করে—কিন্তু মুশা খাঁ জীবিত থাকতে তাদের প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা নেই দেখে—মেঘনার পূর্বদিকে চলে যায়।

ওসমান (বা উসমান) খাঁ ময়মনসিংহে ঘাঁটি গাড়েন, কররাণীরা চলে যায় আরও পূর্বে—শ্রীহট্ট দখল ক'রে সে পর্যন্ত নিজেদের শক্তি বিস্তার করে।

জাহাঙ্গীর বাদশা সিংহাসনে বসার পরই বাংলার দিকে নজর দেন।

সাম্রাজ্যের মূল শক্ত করা ছাড়া আরও কারণ ছিল তার।

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, প্রণয়ঘটিতও বলতে পারেন। পৃথিবীর অদ্বিতীয়া রূপসী ও বিদগ্ধী নগর-ঘোষিতা নুরজাঁহা ছিলেন বর্ধমানের ফৌজদার শের আফগানের স্ত্রী।

বিচক্ষণ বাদশা আকবর এই রূপসী মেয়েটির চোখে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর সর্বনাশের ছায়া দেখেছিলেন।

বোধ করি তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে বীর শের আফগানের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে 'আমাশা'র দেশ' সুদূর বাংলায় পাঠিয়ে দেন।

বুঝি ঐখানেই কিছু ভুল হয়েছিল তাঁর।

তখন সম্ভোগের দ্বার অবারিত ক'রে দিলে কিছুদিন পরেই তরুণ সেলিম হয়ত অন্য রমণীতে আসক্ত হতেন, নুরজাঁহাকে (তখন মেহের-উন্নিসা) ভুলতে বিলম্ব হ'ত না।

আনারকলিকে ভুলতেও তো বিলম্ব হয় নি। অথচ একদা আনারকলির জন্যও কি কম উন্মত্ত হয়েছিলেন!

এই বাধাতেই কামনা অধিকতর তীব্র হয়ে উঠল। ঐ নারীকে তাঁর চাই-ই।

তিনি প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই নিজের 'দুধ ভাই' কুৎবউদ্দিন কোকাকে পাঠালেন বাংলার সুবেদার ক'রে।

এবং কোকাসাহেব শের আফগানকে হত্যা ক'রে নুরজাঁহাকে আগ্রায় পাঠানো ছাড়া সাম্রাজ্য দৃঢ় করার আর কোন ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারলেন না।

তখন মুশা খাঁ (ইশা খাঁর ছেলে), সত্রাজিৎ, রঘুনাথ, প্রতাপাদিত্য, বাকলার রামচন্দ্র রায়, অনন্তমাণিক্য এবং ওসমান—এই সব ভূঁইয়া (বা রাজা যাই বলুন) ক্রমশ প্রবল শক্তি সঞ্চয় করেছেন।

পাইক অশ্বারোহী, নৌবহর—কারও কম নয়। সুতরাং কোকাকে সরিয়ে পাঠানো হ'ল জাহাঙ্গীর কুলি খাঁকে, তিনি বাংলার সর্বনেশে আমাশায় প্রাণ হারালেন এক বছর না যেতেই।

এর পর এলেন ইসলাম খাঁ। ইনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দক্ষ শাসক। ধুরন্ধর রণকৌশলীও।

তিনিই মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মুঘল শক্তিকে একছত্রভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

দেশের মাঝামাঝি থাকার জন্য রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলেন ইসলাম খাঁ এবং বাদশার নামে নূতন রাজধানীর নাম দিলেন জাহাঙ্গীর নগর।

মাঝামাঝি থাকলে শুধু যে সব দিকে চোখ রাখার এবং দ্রুত পৌছবার সুবিধা হবে তাই নয়, বড় বড় জাহাজ (তখনকার দিনের হিসেবে) এখানে অনায়াসে আসতে পারবে।

বাংলাদেশে যুদ্ধ করতে হ'লে নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা ইসলাম খাঁ বুঝেছিলেন।

অথচ রাজমহল তখনই প্রায় অনাব্য হয়ে পড়েছে।

ইসলাম খাঁ প্রথমদিকে পূব ও দক্ষিণ বঙ্গের 'বাঘা' ভূঁইয়াদের দমনে মন দিয়েছিলেন।

সেটা সারা হ'লে এদিকে নিশ্চিন্ত হয়ে দুর্ধর্ষ বীর ওসমান খাঁর দিকে মন দিলেন (১৬১১ খ্রীঃ)।

কাজটা খুব সহজ হয় নি অবশ্যই।

ওসমান প্রতিপদে বাধা দিয়েছিলেন। তবু, তৎসত্ত্বেও ইসলাম খাঁর বাহিনী তাঁকে পরাজিত ক'রে রাজধানী বোকাইনগর দখল করল।

ওসমান পিছিয়ে গিয়ে সিলেটের পাঠান সর্দার বায়াজিদ করবানীর কাছে আশ্রয় নিলেন।

তখনই তার পিছু নিয়ে তার শক্তি নির্মূল করা উচিত ছিল, কিন্তু সে সময় পান নি ইসলাম খাঁ।

কারণ এধারে আবার প্রতাপাদিত্য মাথা তুলেছেন।

প্রতাপ প্রথমে নিজেই আগু বাড়িয়ে এসে সন্ধি করেছিলেন।

আসলে বৃহত্তর শক্তি সঞ্চয়েরই কৌশল ওটা।

বাহিনী গড়েও ছিলেন বিপুল।

এবারে তাঁর নৌবাহিনী বিনা কারণে আকস্মিক ভাবে আক্রমণ ক'রে মুঘলদের নৌবাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিল।

নিজেই সন্ধি ভঙ্গ করলেন প্রতাপ।

তবে তার শোধ নিতে ইসলাম খাঁরও দেরি হয় নি।

তিনি অন্যান্যদের পদানত ক'রে অব্যাহতি দিলেও প্রতাপাদিত্যকে শৃঙ্খলিত ক'রে আগ্রায় পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে এবার ওসমান দমনে মন দিলেন ইসলাম খাঁ।

মুঘলবাহিনী সংখ্যায় বিপুল, শক্তিতে অজেয়। কিন্তু শ্রীহট্টের দৌলম্বপুরে যে রক্তক্ষয়ী সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছিল—তাতে ওসমানের শৌর্য বীর্য ও যুদ্ধ পরিচালনারই জয় হ'ত সেদিন (১২।৩।১৬১২)—মুঘলবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পিছু হঠতেই শুরু করেছিল—কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তখন পাঠানদের ত্যাগ করতে যেন দৃঢ়সঙ্কল্প। একেবারে গভীর রাত্রে একটা রব উঠল—ওসমান খাঁ নিহত হয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাহিনী ব্যাকুল ও সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পলায়নের চেষ্টায় তৎপর তারা সবাই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ব্যস্ত। ওসমানের ছেলে ও ভাতিজারা অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু তখন ঘোর অন্ধকার,

মশালের আলোয় বরং আলো-আঁধারিরই সৃষ্টি হয়—কে কোথায়, কে মুঘল কে পাঠান—চেনাই মুশকিল।

তাছাড়াও দেখা গেল অন্য পাঠান সর্দাররাও ভয় পেয়েছেন, তাঁরা আর যুদ্ধ করতে আগ্রহী নন, সন্ধি করতেই উৎসুক।

ফলে সেই যুদ্ধেই বলতে গেলে পূর্বাঞ্চলে পাঠান-শক্তি মুঘল-মহিমার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'ল।

এই পর্যন্ত গেল ইতিহাস। এইটুকুই মাত্র ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যা ইতিহাসে নেই, সেই কথাই আজ বলতে বসেছি।

॥ ১ ॥

সে দিন সেই নিশীথ রাত্রে কি ওসমান খাঁ সত্যই নিহত হয়েছিলেন ?

তা যদি হয়ে থাকেন, তাঁর মৃতদেহ গেল কোথায় ? আর কার হাতেই বা নিহত হলেন।

যদি মুঘলদের কেউ ক'রে থাকেন—তিনি এ গৌরব দাবী করবেন না, তা নিয়ে গর্ব ক'রে বেড়াবেন না, মুঘল দরবারে পুরস্কার প্রত্যাশা করবেন না, তা কি সম্ভব ?

আসলে কেউই জানে না সে মৃত্যুর বিবরণ, কোন তথ্যই কোথাও পাওয়া যায় না।

আমরা জানি তিনি নিহত হন নি।

অথবা নিহত হয়েছিলেন বহু পূর্বেই।

হেঁয়ালি শোনাচ্ছে ?

সেই কথাই বলছি এখানে।

আর এ তো, বলতে গেলে সনাতন কাহিনী।

সীতা, দ্রৌপদী, হেলেন—এঁরা তো জগদ্বিখ্যাত। অখ্যাতরাও কম যায় না কেউ।

স্ত্রীলোক ছাড়া এমন সর্বনাশ কোথায় কবে ঘটেছে ? আপাত এমন খবর পাওয়া না গেলেও—একটু ভাল ক'রে খুঁজে দেখুন—এমন কারণ ঠিক পেয়ে যাবেন।

বোকাইনগর ছেড়ে ওসমান যখন শ্রীহট্টে যাচ্ছেন—তখনও তিনি অক্ষত ছিলেন না।

তখনও বেশির ভাগ যুদ্ধ ঢাল তলোয়ার ও বর্শায় হলেও কামান বন্দুকের প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে।

সেই স্থানীয় কামারদের তৈরী গাদা বন্দুকের একটি গুলি এসে লাগে ওসমানের বাঁ কাঁধে।

আঘাত গুরুতর কি না—তা কারও দেখার সময় ছিল না, তেমনি তা থেকে যে প্রচুর রক্তক্ষরণ ঘটেছিল সেটা কারও চোখে না পড়ার কথা নয়।

বিশ্বস্ত অনুচররা প্রস্তাব করেছিলেন কয়েকটা বর্শা দিয়ে চালি-মতো ক'রে দুটো

ঘোড়ার ওপর ক'রে শুইয়ে নিয়ে যাবার—কিন্তু, ওসমান সে কথা শোনেন নি, জিদ ক'রে ঘোড়ায় চেপেই ছুটে ছিলেন শত্রুর থেকে যত কম সময়ে যত বেশী দূরত্ব রচনা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে।

সময়টাই তখন বড় প্রশ্ন।

শত্রু প্রবল, তায় বিজয়ী, তাঁর বাহিনী তখন সংখ্যায় স্বল্প, তদুপরি ভীত, ত্রস্ত, ছত্রভঙ্গ।

শত্রু তাঁকে বন্দী করার জন্য ব্যস্ত, সেটাই তখন একমাত্র লক্ষ্য তাদের।

সুতরাং এখন এই মুহূর্তে কাপুরুষের মতো পালানো ছাড়া আত্মরক্ষার ও ভবিষ্যৎ চিন্তার অন্য কোন পথ নেই।

কিন্তু শরীর এত বুঝবে না। সে যন্ত্র—যন্ত্রের নিয়মেই কাজ ক'রে যায়।

এমনিই বহু আঘাত সহ্য করেছেন ওসমান, বিশেষ এই নৈশ যুদ্ধে, তার কতটা নিজের লোকের হাতে কতটা শত্রুপক্ষের হাতে তা বলা শক্ত—তার ওপর সারা দিন-রাত নিদারুণ পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, দায়িত্ব সব জড়িয়ে দেহ এমনিই ক্লান্ত—ফলে মাথাও যেন তখন আর তেমন কাজ করছে না।

তখন একটু বিশ্রাম, একটু শুশ্রূষার একান্ত প্রয়োজন।

মনে হচ্ছে এই মাটিতে বা মাঠে, কোথাও একটু শুয়ে পড়তে পারলে আবার চলবার বা চিন্তা করার শক্তি ফিরে পাবেন।

সেই ইচ্ছাতে বা হিসাব বুদ্ধি আচ্ছন্ন হবার ফলেই কিম্বা ঘোড়াকে প্রাণপণ ছোটানোর জন্য—কখন যে দল-ছুট হয়ে একেবারে একা পড়ে গেছেন তা বুঝতে পারেন নি।

তবুও চলেছিলেন—কতকটা যেন অজ্ঞাতসারেই। অর্ধ চৈতন্য অবস্থায়—কিন্তু এক সময় পাহাড়ী পথে ঘোড়া হোঁচট খাওয়ায় টাল সামলাতে না পেরে হেলে পড়লেন।

একেবারে পড়েই যেতেন—কিন্তু অসংখ্য যুদ্ধের নায়ক ওসমানের অভ্যাসগুলো স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সে অভ্যাসই তাঁর কাজ করল। পড়তে গিয়েও কোনমতে ডান হাতে একটা গাছের ডাল ধরে সেই পড়াটা সামলে নিলেন।

কিন্তু তখন আর উঠে বসাও সম্ভব নয়। গড়িয়ে পড়ার মতো নেমে পড়ে একটা কাঁটা গাছের তলায় বসতে বাধ্য হলেন।

আর তখনই মনে পড়ল সহচরদের কথা।

তারা কৈ ?

দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, তবু যেন প্রাণপণেই একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ—আলো না দিক অন্ধকারটা কিছু দূর করেছে—ওদিকে পূর্বাকাশেও, একটু একটু ক'রে লজ্জারঞ্জিত উষা উঁকি মারছেন—সুতরাং বেশ কিছুদূর পর্যন্ত দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই।

সামনে পিছনে ডাইনে বামে শুধুই উচ্চাবচ ভূমি, কিছু কিছু চাযের ক্ষেত—দু'একটি পত্রবিরল গাছ—খুব দূরে বোধ হয় দু'একটা বেত-ঝোপও—কিন্তু মানুষের কোন চিহ্ন নেই। আর বেশীক্ষণ খোঁজবারও সামর্থ্য ছিল না।

মনে মনে একবার—চৈতন্য হারাবার পূর্ব মুহূর্তে ওসমান আল্লাকে স্মরণ করতে পেরেছিলেন, বোধ করি একবার এই দুরূহ জীবন থেকে, এই নিরন্তর ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার দায় থেকে অব্যাহতিও প্রার্থনা ক'রে থাকবেন- কিন্তু সে সব কিছুই স্পষ্ট ভাবে মনে ছিল না।

দেহটা অবশ শিথিল হয়ে যেই মাটিতেই লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু উনি তার আগেই সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন—কিছুই আর বোঝার বা মনে রাখার শক্তি ছিল না।

যে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিলেন ওসমান, সে ওঁর বড় প্রিয় ঘোড়া।

বিশ্বস্ত। বোধ করি ওঁর প্রতি প্রণয়াসক্তও।

হ্যাঁ, পশুদেরও প্রণয় জন্মায় মানুষের প্রতি—পাত্র বিশেষে। এবং সে প্রণয় অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, তেমন নয় অর্থাৎ অচিরস্থায়ী নয়।

ওদের সে প্রণয় এবং কৃতজ্ঞতাবোধ না থাকলে ওসমানের সে দিন সেইখানেই জীবনাবসান হ'ত।

শৃগাল, বাঘ, হায়েনা—চারিদিকে অগণ্য আরও কত হিংস্র মাংসাশী জন্তু।

তাদেরই ভক্ষ্য হ'ত তখনও-প্রাণ-থাকা অচেতন দেহটা।

আদর ক'রে ঘোড়ার নাম রেখেছিলেন ওসমান—কতকটা নিজের নামের সঙ্গে অক্ষর ও শব্দ ব্যবহারের মিল রেখে—আসমানী।

ঘাড়ের চুলগুলির রঙে নাকি আসমানের মতোই ঈষৎ নীলাভা ছিল—তাই আসমানী।

আসমানী, যা মনে হয়, প্রথমটা অত বুঝতে পারে নি।

প্রভু নেমে পড়েছেন ইচ্ছে ক'রে—এইটেই মনে করেছিল। তাই সে ঘুরে কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তবে বেশীক্ষণ নয়—মৃত ও আহত দেখে দেখে অভ্যস্ত আসমানী একটু পরেই বুঝেছিল বোধহয়, এ ঠিক বিশ্রাম নয়, ইচ্ছাকৃতও নয়—তার চেয়ে গুরুতর কিছু—বিপজ্জনক।

এখনই অন্য কোন সক্ষম সক্রিয় মানুষ এসে না পড়লে মালিকের প্রাণ রক্ষা হবে না।

আসমানী ঘাড় তুলে নাসারন্ধ্র একটু বিস্ফারিত ক'রে যেন চারিদিকের ঘ্রাণ নিল—বোধ করি হিংস্র পশুর গন্ধ পেয়ে থাকবে—গরু ঘোড়া এ গন্ধ পায় বহু দূর থেকেই—তারপর আরও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল ছোট্ট একটা টিলা মতো উঁচু জায়গায়।

সেখান থেকে চারিদিকের বেত ও কাঁটাবন, গাছ ও আগাছার জঙ্গলের মাথা ছাপিয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

দেখতে পেলও। খানিকটা দূরে একটা অপেক্ষাকৃত নিচু পাহাড়ের তলায় কয়েকটা ঘর—এদেশের দরিদ্র কৃষিজীবী বা অন্য বন্যবস্তু উৎপাদনজীবীদের (পাখীর পালক, পশুচর্ম, লোম, বেত কাঠ থেকে জিনিস তৈরী করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে।) যেমন নিচু পাতা-লতার ঘর হয়।

দু' একটা ঘরের কাছে অত ভোরেই ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। আলোর চিহ্নও। তখনও অন্ধকার আছে, তবু এরা তো শেষ রাতেই জেগে কাজেকর্মে লেগে যায়।

আসমানী আর দাঁড়াল না। সে ছুটে চলে গেল সেই দিকে।

দূর থেকে ঘরগুলিকে যত ঘনসম্বদ্ধ মনে হয়েছিল কাছে গিয়ে দেখা গেল ততটা নয়। বেশ ছড়ানো ছিটোনো।

তা হোক। অত দেখার, অত হিসেবের সময় বা সাধ্য নেই আসমানীর। সামনেই যে ঘর পড়ল, একক ও সামান্য, তার কাছে গিয়েই সে ডেকে উঠল।

উচ্চরবে পর পর দু তিন বার।

ঘরের অধিবাসীদের বিস্মিত হবারই কথা। ভয় পাবারও।

ঘোড়া এসব গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ পাহাড়ে-জঙ্গলে থাকে না। এদের কারও পোষারও প্রয়োজন পড়ে না।

ঘোড়া মানেই যুদ্ধের চিহ্ন। মুঘল-পাঠানে হিংস্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হচ্ছে তা তারা শুনেছে।

যুদ্ধ মানেই লুঠতরাজ, নারী নিগ্রহ, ক্রীতদাস-দাসী সংগ্রহ।

তাই যুদ্ধ বাধলে বা কোন বাহিনী এ পথে অগ্রসর হচ্ছে শুনতে পেলে বহুদূরের অধিবাসীরা আতঙ্কে কণ্টকিত থাকে।

তাই ঘোড়ার ডাক মানেই সেই নির্যাতনকারীরা কাছে এসে পড়েছে।

একা বা একাধিক—ভাবার শক্তি থাকে না তখন, ভয়ে কাঠ হয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হ'ল না।

আসমানীও তখন অধীর, ব্যাকুল। সে ডেকেই চলেছে। পাও ঠুকছে মধ্যে মধ্যে, অসহিষ্ণু ভাবে।

ঘরে যারা ছিল—এবার তাদেরও মাথায় কথাটা গেল। ঘোড়ার ওপর কেউ সওয়ার থাকলে সে এতক্ষণ নেমে পড়ত। হুঙ্কার ছাড়ত। আর ঘোড়াও একটিই মনে হচ্ছে, একই ডাক।

এবার ভরসা ক'রে সে ঘরের দুজন অধিবাসীই বাইরে বেরোল। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি লাঠি নিচ্ছিল একটা, মেয়েটি নিরস্ত করল।

যদি সিপাহী বা সিপাহ্সলার কেউ হয়—লাঠি দেখলে আরও অত্যাচার করবে। কৃপা ভিক্ষা করলে, পদানত হলে তবু কিছুটা অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে—একথা ঐটুকু মেয়েই জেনেছে এতদিনে।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে একটা মাত্র ঘোড়া—যুদ্ধের ঘোড়াই, সাজ দেখলে যা মনে হয়—তার পিঠে বা কাছে কোন সওয়ার নেই দেখে যেমন আশ্বস্ত হ'ল তেমনি বিস্মিতও।

বিস্মিত হ'ল তার পাগলের মতো কাণ্ড-কারখানায়।

সে ওদের দেখেই আর একবার চিঁহিহি ক'রে ডেকে উঠে দূরের দিকে ছুটে চলে গেল—আবার তখনই ফিরে এসে তেমনি ডাকতে আর পা ঠুকতে লাগল।

কথাটা হঠাৎ মাথায় যাওয়া—ওর নীরব ইঙ্গিতের অর্থ বোঝা—সম্ভব নয়। এদেরও দেরি হ'ল।

বুঝল, মনে পড়ল কিশোরী মেয়েটিরই।

ওদের একটা কুকুর ছিল। বুনো কুকুরই। কিছু কিছু খেতে পেত বলেই ওদের ঘরের পিছন দিকের আঙিনামতো খোলা জমিটাতে এসে শুয়ে থাকত।

এ বাড়ির অধিবাসী বলতে তখন ওরা মাত্র দুজনই। বৃদ্ধ দুলগু আর তার কিশোরী পৌত্রী আপুচি।

বাড়ি বলতে অবশ্য এই তো এক ছ-চালা ঘর।

তাতেও ভরা সংসারই ছিল একদিন। আপুচির মা বাপ দুজনেই মারা গেছে। একজন জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের মুখে, আর একজন শজারু ধরার ফাঁদ পাততে গিয়ে সাপের হাতে।

হাত ছাড়া কি বলা যায়। এখানের গুয়া গাছের মতো লম্বা অজগর কামড়ায় না, জড়িয়ে পিষে মাটির মতো ডেলা পাকিয়ে দেয়।

তাই আপুচি তার দাদাকে আর জঙ্গলে যেতে দেয় না। আশপাশের জমিতে যা সামান্য চাষ হয় তাতেই চলে যাবে। বেশী লোভ করে লাভ কি, কার জন্যে করবে—এই যুক্তি দিয়ে যাওয়া বন্ধ করে।

তবে প্রাকৃতিক কাজের জন্যে একটু গাছপালার আড়ালে তো যেতেই হবে।

সেই ফাঁকের মধ্যে বৃদ্ধ তুলঙ্ একটু-আধটু ওদের জাতব্যবসা চালাবার চেষ্টা করত।

সে দিন এই ভাবে এগোতে গিয়ে একটু বেশী জঙ্গলে গিয়ে পড়ে।

তখনও বেশ গাঢ় অন্ধকার, অত দেখতে পায় নি তাই একটা বড় পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। তার ফলে পা ভেঙে যায়।

ওঠবার শক্তি তো ছিলই না। একটু অজ্ঞান-মতোও হয়ে পড়েছিল।

তুলঙ্ বা আপুচি যখনই জঙ্গলে বা 'বাইরে' যেত, কুকুরটাও ওদের পিছু পিছু বা পাশে পাশে ছুটত ল্যাজ নাড়তে নাড়তে। সেটা যেন ওর কর্তব্য বলে মনে করত। স্নেহের প্রতিদান।

যারা খেতে দেয় তাদের জন্যে এটুকু না করলে চলবে কেন ?

সে-ই তুলঙ-এর এই অনড় অবস্থা দেখে এমনি ছুটে এসে আপুচির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই ভাবেই ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকছিল আর একটু পরে পরে ছুটে জঙ্গলের একটা বিশেষ দিকে চলে যাচ্ছিল। তবু আপুচি ওকে অনুসরণ করছে না দেখে আবার ছুটে এসে তেমনি ঘেউ ঘেউ করছিল।

শেষে ওর পোশাকের প্রান্ত ধরে টানতেও শুরু করল।

জঙ্গলের একটা বিশেষ দিকেই বারে বারে যাচ্ছে দেখে সন্দেহ হ'ল আপুচির। কোন একটা ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছে না তো ? দাদাও তো এখনো ফিরছে না।

কুকুরটার সঙ্গে গিয়ে বুড়োকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেল।

আর কিছু দেরি হলে হয়ত গোটা পাওয়া যেত না। এর মধ্যেই যে কিছু হয় নি—সেও বোধহয় ঐ কুকুরটার জন্যেই।

এ জঙ্গলে নেকড়ে আছে, সম্ভবত হায়েনাও। মাঝে মাঝে চিতাও এসে পড়ে।

কুকুরের ডাক শুনলে ওরা একটু ইতস্তত করে কাছে আসতে, ভাবে শিকারীদের টোপ এটা।

একটু খানি মেয়ে তখন আপুচি—নেহাৎ বুনো পাহাড়ী মেয়ে বলেই কোনমতে টানতে টানতে দুলঙকে নিয়ে এসেছিল ঘরে।

ও! কুকুরটার তখন কি অবস্থা! নেচে, লাফিয়ে, ডিগবাজী খেয়ে, চেঁচিয়ে—কি ভাবে সার্থকতার আনন্দ প্রকাশ করবে যেন ভেবে পায় না সে!

সে দিনের সেই কথাটা মনে পড়তেই আপুচি আর দেরি করল না।

একেবারে দাদার হাত ধরে টানতে টানতে দাওয়া থেকে নেমে পড়ল, 'একবার চলো তো দাদা ঐ দিকটা দেখে আসি। কেউ বোধহয় সাংঘাতিক জখম হয়েছে কিম্বা খুব বিপদে পড়েছে—সেই জন্যেই ঘোড়াটা অমন করছে!'

দাদা যে খুব খুশী হ'ল না এ প্রস্তাবে—তা বলাই বাহুল্য।

অপ্রসন্ন মুখে বলল, 'আবার কেন এত ঝামেলার মধ্যে যাচ্ছিস বাপু। বাইরের বিপদ ধরে টেনে আনা। যদি লড়াইয়ে-ফৌজের কেউ হয়—হেরে পালাচ্ছে এমন হয়—তাকে ঠাঁই দেবার দায়ে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে কি কেটে ফেলবে। তোর তো আরও দুর্গতি। ওরা জাত যে বড় খারাপ। ফৌজী লোকদের কি দয়া মায়া বিচার বিবেচনা আছে! যাকে বাঁচাবি সে-ই হয়ত তোকে ধরে নিয়ে যাবে!—'

গজগজ করতেই থাকে বৃদ্ধ।

আপুচি ছুটে যেতে যেতেই জবাব দেয়, 'তাই বলে একটা মানুষকে শ্যাল-কুকুরের মুখে ঠেলে দেব? যদি কেউ বেইমানী করে তার বিচার ভগবান করবেন!'

আসমানীর ইঙ্গিত এরা বুঝতে পেরেছে সেটা বুঝে সে আর ছোটার চেষ্টা করল না। এদের গতির সঙ্গে তাল রেখেই আগে আগে চলতে লাগল—যেন পথ দেখিয়ে।

অনেক দূর থেকেই দেখা গেল ওসমান খাঁর বিশাল দেহ মাটিতে পড়ে। যুদ্ধের বেশ, বুকে চামড়ার বর্ম—তবু সুলতানের পোশাকে—মূল্যবান আঙরাখার দৃশ্য অংশ হরিতে হিরণে রঞ্জিত। তাতে প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভা পড়ে ঝলমল করছে—বহু দূর থেকেই তা চোখে পড়ে।

কাছে আসতে আরও চোখে পড়ল—কোমরবন্ধে সোনার সঙ্গে কী সব পাথর বসানো—তা থেকেও যেন আলো ছিটকে পড়ছে। তলোয়ারের খাপ চামড়ার—তাও মূল্যবান। আঙরাখার অনেক জায়গাই রক্তে লাল হয়েছে তবে তাতে যেন আরও সুদৃশ্য হয়ে উঠেছে তা।

বর্শাটা দূরে কোথায় ছিটকে পড়েছে হয়ত, মুঠোর ভঙ্গীটা এখনও তেমনিই আছে।

প্রৌঢ় ওসমান। বয়স কত হবে তা ঠিক ঠাওর না হলেও কানের ওপরের চুলে পাক ধরেছে—তাতে এটা অন্তত বোঝা যায় তিনি যৌবন অতিক্রম করেছেন।

কিন্তু বীর, বিশেষ করে যোদ্ধারা কি বৃদ্ধ হয়? আপুচির মনে হ'ল এমন সুন্দর মানুষকে আর কখনও দেখে নি।

এক নজরেই সব দেখা বলতে গেলে।

সাংঘাতিক রকমের জখম হয়েছেন। কতক্ষণ ধরে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে কে জানে। সে রক্ত জমাট বেঁধে আপাতত হয়ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিছুটা—তবে তুলতে গেলেই চাড় লেগে আবার শুরু হবে। আর তুলবেই বা কে?

আপুচি দাদাকে হুকুমের স্বরে বলল, 'তুমি পায়ের দিকটা ধরো—আমি মাথার দিকে থাকি। পারব না নিয়ে যেতে?'

'এই মড়া তুই ঘরকে নিয়ে যাবি? তুই কি পাগল হলি নাকি? ও পড়ে থাক। খুনে ডাকাত সব—বাঘে খায় সেই ভাল।'

'না, আমি এভাবে একটা মানুষকে ফেলে রেখে যেতে পারব না। তুমি না ধরো আমি একাই যা পারি করব। নয়ত এখানেই পাহারা দিয়ে থাকব।'

ওদের এই কথাবার্তার মধ্যে আসমানী কি বুঝল কে জানে। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসল।

সে আস্তে আস্তে, একেবারে মালিকের দেহটার কাছে এসে কোনমতে যেন খানিকটা পা মুড়ে বসে পড়বার মতো ক'রে পিঠটা নামাল।

এবার আর বুঝতে দেরি হ'ল না আপুচির।

'বা রে ঘোড়া। তুই ঘোড়া না মানুষ? লোকটা যদি বাঁচে তোর জন্যেই বাঁচবে।'

এবার বোধহয়, সামান্য একটা পশুর মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস দেখে, ডুলঙ-এর লজ্জা হ'ল।

সে এগিয়ে এসে পায়ের দিকটা ধরল ওসমান খাঁর। আপুচি আগেই হাতের নিচে দিয়ে নিজের ছোট ছোট হাত দুটি ঢুকিয়ে কাঁধের দিকটা ধরেছিল। এই ভাবে টেনে হিঁচড়ে দুজনে মিলে ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে দিল উপুড় ক'রে।

কিন্তু তবু ঘোড়া ওঠে না।

উঠছে না কেন? কি হ'ল আবার?

প্রশ্নটা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবেগেই উত্তরটাও মনে এসে গেল আপুচির। সে আরও একবার ঘোড়াকে বাহবা দিল।

লাশটা ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে বাঁধা দরকার। নইলে পরে, চলতে গেলে কেন—হয়ত ওঠবার সময়ই—পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে।

বড় ঘোড়া, বেশ উঁচু। এরা যে সব সময় ধরে রাখতে পারবে তা নয়।

এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল একটা মোটা লতা উঠে গেছে—পাশের একটা কি বড় গাছে।

সে টানাটানি ক'রে লতাটা নামাল—কিন্তু শক্ত লতা, কাটবে কি দিয়ে?

এইবার দুলঙের কাছে হার মানতে হ'ল ওকে।

দুলঙ্ প্রাতঃকৃত্যের সময় বেরিয়ে কিছু কিছু এটা ওটা সংগ্রহ করে—বাণিজ্য করার মতো জিনিস। সে জন্যে কোমরে সর্বদাই পাতা জড়ানো কাস্তের মতো সরু একটা ভোজালি থাকে।

সে একটানে লতাটা দুখানা ক'রে দিল।

ওপর দিকটা একপ্রস্থ বাঁধা হ'ল ঘোড়ার গলার সঙ্গে—এবার সাবধানে উঠে দাঁড়াল আসমানী। পেটের দিক থেকেও একটা বাঁধন লাগানো শেষ হতে আস্তে চলতে লাগল—মন্থর গতিতে—আপুচিদের ঘরের দিকে।

এরা যে তার প্রভুর বান্ধব, হিতকামী—সে বিষয়ে সে নিশ্চিত হয়েছে ইতিমধ্যে।

॥ ২ ॥

এরপর অবশ্য বৃদ্ধ দাদার কাছ থেকে পরিপূর্ণ সহযোগিতাই পেল আপুচি।

ঘাড়ে যখন পড়েইছে, ঘরেই এনে তুলতে হয়েছে—তখন আর 'আনা উচিত কি না' তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

বরং, এখন এ আপদ যত শীঘ্র ঘাড় থেকে নামে ততই মঙ্গল।

সে জানেও অনেক কিছু। এই অরণ্য ও পর্বত-এর মধ্যেই তার জন্ম এখানেই সে বড় হয়েছে। মৃত্যুর সময় হতে চলল; এখান থেকে আর কোথাও যায় নি।

এখানে কি আছে না আছে সবই তার বলতে গেলে নখদর্পণে।

এখানের আরণ্য-সম্পদ, এখানের ওষধি—সবই।

সে তখনই কোথা থেকে পাতা লতা সংগ্রহ ক'রে এনে পাথরে থেঁতো করতে বসল।

নাতনীকে হুকুম করল, 'ওর পোশাকটা খুলে দে, দেখি কোথায় কি কতটা চোট!'

সেটাও কঠিন কম নয়। আশেপাশের বসতি থেকে কাউকে ডেকে আনতে পারলে হ'ত। কিন্তু আপুচি বুঝেছে লড়াইয়ের খবরে সকলেই কাঁটা হয়ে আছে। সেই দলেরই একজন শুনলে কেউ আসবে না। হয়ত খবর পৌঁছেই গেছে—নইলে ঘোড়ার পায়ের শব্দ এই নির্জন জায়গায় বহু দূর যায়—কৌতূহল মেটাতে অনেকেই ছুটে আসত।

অথচ এত বড় দেহখানা—এপাশ থেকে ওপাশে ফেরানো, আবার ওপাশ থেকে এপাশ। তিন-চার বার না ফেরালে পোশাক খুলবে কি করে!

এসব পোশাকের অন্ধিসন্ধি কিছুই সে জানে না। তাদের পোশাকের ব্যাপার খুব সহজ—নিতান্ত লজ্জা নিবারণের জন্যে যেটুকু দরকার। বল্কল বা তুলো থেকে সুতো কেটে ঘরের তৈরী কাপড় এক ফালি বুকে বাঁধা—গামছার মতো।

এদের এসব পোশাকের বন্ধন উন্মোচনের রহস্য বুঝতেই সময় লাগে। কত গিঁট কত পর্দা।

অনেক জায়গায় রক্তের সঙ্গে শুকিয়ে সেঁটে গেছে, খুলতে গিয়ে নতুন ক'রে সে সব ক্ষত থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগল।

বৃদ্ধ অবশ্য এটা আগেই অনুমান করেছিল। সে জন্যে প্রস্তুতও ছিল। সে ঐ লতাপাতার রসে আরও কী সব মিশিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই ঘায়ে লাগাতে থাকল। তাতে রক্ত পড়া বন্ধও হ'ল দেখতে দেখতে।

তারপর অমনি কি সব পাতা লতা ফুটিয়ে পুলটিসের মতো আবার কাটা জায়গাগুলোয় লাগিয়ে দিল। কোথাও কোথাও বাঁধবারও দরকার হ'ল পাতা ঢাকা দিয়ে—নইলে ওষুধ লেগে থাকবে না।

ওদের এখানে গুটি থেকে রেশম হয়—ঘরে ঘরেই কিছু চাষ আছে।

চাষ হিসেবে করতে জানে না অবশ্য। আপনিই কতকগুলো গাছে গুটিপোকা বাসা বাঁধে। সে গুটি থেকে রেশম হয়। রেশম থেকে খাটো বহরের কাপড়। তাই ঘুরিয়ে বা সেলাই করে ঘাঘরার মতো অত বেশী কাপড় ব্যবহার করে না এরা, এক প্রস্থ, সেলাই করা গামছার মতো একটা জিনিস দাঁড়ায় তাই মেয়েরা পরে। পুরুষ পরে সেলাই না ক'রেই।

তবে সকলে এ রেশম পায় না, সব সময়ে পরেও না।

গাছের বাকল থেকে বা তুলো থেকে সুতো বার করে সকলেই ঘরে ঘরে।

কে জানে কেন, বোধহয় ওসমান খাঁর মহার্ঘ বেশভূষা দেখে সম্ভ্রম এসে থাকবে মনে, রাজ-অতিথির ক্ষতে রেশমের কাপড়ই বেঁধে দিল তুলঙ্।

তারপর হঠাৎই এক সময় তাড়া দিয়ে উঠল, 'তা এবার ও মড়াটাকে কিছু খেতে দে। না শুধু ওষুধেই চলবে?'

'তুই একটু দুধ গরম ক'রে দে না দাদা।'

'দূর। এখন দুধ খাওয়াবি কেমন ক'রে? ও কি গিলতে পারবে? এখন মুখটা ফাঁক ক'রে একটু একটু ক'রে মধু দে। যদি দেখিস ঠিক যাচ্ছে, অল্প অল্প ক'রে বরং মুখের মধ্যে ঢেলে দিস। খানিকটা মধু পেটে গেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে, জ্ঞানও ফিরবে।'

আপুচিও কথাটা বুঝল। মধু ঢের আছে বাড়িতে। মধুতে জোরও বেশী।

সে প্রথমে কিছুক্ষণ ঠোঁট ফাঁক ক'রে গালের ভেতরে ভেতরে মধু লাগিয়ে দিতে লাগল। পরে মনে হ'ল যেন ঢোঁক গিলল বার দুই।

তখন একটু চাপ দিতে দাঁতও খুলল। মুখ হাঁ হ'ল। তাও আগে জিভে লাগিয়ে দিল। তারপর একটু ক'রে মুখে ঢেলেও দিতে লাগল। অচৈতন্য শরীর নিজের কাজ ক'রে যেতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলতে লাগল।

ওসমানকে মধু খাওয়াতে খাওয়াতেই মনে পড়ে গেল ঘোড়াটার কথা।

'আহা রে ! দাদ, ঘোড়াটার কি হবে ?'

'কিসের কি হবে ?'

'ওর মুখে যে লাগাম জিন কষা। ওগুলো খুলে না দিলে তো ঘাস খেতে পারবে না। তুই পারবি না খুলতে ?'

'আমার চোদ্দ পুরুষে কখনও ঘোড়ার গায়ে হাত দেয় নি। এই প্রথম দিলুম। ও আমি জানি না। আর খুলতে যাবও না। আনাড়ির মরণ, টানা-টানি করতে যাই তারপর কিসে কি হবে—তখন মারুক লাথ। তোর কাজ হয়ে থাকে তুই যা গিয়ে।'

বিপন্ন মুখে আপুচি বাইরে এল। দেখল খুব সহজে না হলেও অল্প অল্প ঘাস খেতে পারছে, মুখে লাগাম থাকা সত্ত্বেও।

কাছে এসে গায়ে হাত চাপড়ে কানের কাছে মুখ এনে বলল আপুচি, 'অমনি ভাবেই একটু কষ্ট ক'রে খা ভাই। আমি যে কিছুই জানি নে তোর সাজ-পোশাকের ব্যাপার।'

আসমানী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বোধ হয় এই রূপসী কিশোরী মেয়েটির আদর উপভোগ করতে লাগল।

হ্যাঁ, সুন্দরীই। কালিদাসের বর্ণনা-মতো কি ব্যাসদেবের বর্ণনা-মতো সৌন্দর্যের নিরিখ ধরে মিলিয়ে নিলে হয়ত মিলবে না তবু সুন্দরী।

সম্পূর্ণ নিরাভরণা, সামান্য-বেশা মেয়েটিকে তাদের ঐশ্বর্যের দৈন্য বা প্রসাধন সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব তুচ্ছ ক'রেই—বা তুচ্ছ করার জন্যই—ভগবান বা প্রকৃতি যাই বলুন, যেন তাকে অতুলনীয় ক'রে গড়েছেন।

ওর পেলব কোমল তনুলতা দেখলে মনে হয়—হরিদ্রাভ পদ্ম-কোরক বা চম্পককলির সঙ্গে মধূখ মিশ্রিত ক'রে তাকে গড়া হয়েছে। তার মুখের দিকে চাইলে শিশির-ধৌত প্রত্যূষের পুষ্পের কথাই মনে পড়ে।

সেদিন সমস্ত দিন বা রাত্রেও জ্ঞান ফিরল না ওসমানের।

আপুচিও প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে ওর পাশে বসে রইল।

প্রায় শব্দ ব্যবহার করার কারণ দুলডুএর অবিরাম তিরস্কারে বা অনুযোগে বিরক্ত হয়ে একবার মাত্র উঠে গিয়ে কি খানিকটা খেয়ে এসেছিল।

কী যে—চেয়েও দেখে নি, মনেও নেই।

তবে ঘুমোয় নি একটুও।

জ্ঞান না থাকলেও দেহ তার আপন ধর্ম পালন করবে বৈকি।

মধু, দুধ, ফলের রস, ওষুধ—এসবেও তা ত্বরান্বিত ক'রে থাকবে। ফলে বার-বারই তা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হচ্ছিল।

আর কে-বা করবে। প্রথম প্রথম ভুলঙ্ পুরুষের নিম্নাঙ্গে হাত দিতে দেয় নি আপুচিকে। কিন্তু সেও বুড়োমানুষ, কতক্ষণ জাগবে? তার দেহ ভেঙে এল।

চেরা বাঁশের চেটাইয়ের ওপর সামান্য শয্যা। দ্রুত পরিষ্কার ক'রে নেওয়াও প্রয়োজন। ঘুমন্ত মানুষকে ঠেলে তুলে কথাটা বুঝিয়ে ডেকে আনতে তর সইবে না।...

জ্ঞান হ'ল একেবারে পরদিন প্রত্যূষে।

চোখ মেলে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত অ-দৃষ্টপূর্ব পরিবেশ দেখে কিছুই বুঝলেন না।

তিনি কোথায় আছেন, কেন এখানে এসেছেন, কে-ই বা আনল, কি করছেন এখানে—কিছু বুঝতে না পেরে বিহ্বল হয়ে চেয়েই রইলেন কিছুক্ষণ।

এদিক ওদিক ঘুরে তাকাতে পারছেন না, ঘাড় মাথা আড়ষ্ট, কি সব যেন বাঁধা তাতে। শুধু কুটিরের চালাটাই লক্ষ্যে পড়ল। সেই ভাবেই বোঝার চেষ্টা করতে গেলেন।

মাথাতে অসহ্য যন্ত্রণা, দেহ যেন কি জানোয়ারে চিবোচ্ছে।

ভাল ক'রে তো নয়ই—কিছুক্ষণ ধরে কিছু চিন্তা করার মতো অবস্থাও নয়। মনে হ'ল কি সব ভুল দেখছেন। স্বপ্ন দেখছেন হয়ত। আবারও চোখ বুজলেন।

চোখ বুজে থেকেই ভাবার চেষ্টা করলেন।

কে তিনি? হঠাৎ এমন ক'রে সচেতন হলেন কেন? কিসের এত যন্ত্রণা। এত বাঁধনই বা কিসের সর্বাঙ্গে?

অবশ্য এ বিহ্বলতা খুবই অল্প কিছুক্ষণের।

তারপরই কুয়াশা সরিয়ে আলোতে সব স্পষ্ট ক'রে দেখার মতো একে একে মনে পড়ল—তিনি কে, কি হয়েছে তাঁর, কি হয়েছিল।

ওসমান খাঁ তিনি। বঙ্গ ও উড়িষ্যার পাঠানদের শেষ আশা ও ভরসা।

ইসলাম খাঁ মুঘল তাঁকে আক্রমণ করেছিল।

বোকাইয়ের দুর্গ।

বোকাই—উনি সাধ ক'রে যার নাম দিয়েছিলেন বোকাই নগর—এখন মুঘলদের

অধিকারে। উনি পরাজিত, আহত। যা অল্প সৈন্য এবং সামন্ত—সামন্ত বলতে আর কেউ বা কিছু নেই, যা আছে জনকতক সর্দার—সবাইকে বলেছিলেন বায়াজিদের কাছে আশ্রয় নিতে।

নিজেও যাচ্ছিলেন—পরাজিত ও আহত অবস্থায়।

'পরাজিত' শব্দটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিছার কামড়ের জ্বালা অনুভব করলেন। পাহাড়ে-বিচ্ছু এখানে একবার কামড়েছিল তাঁকে। সেই জ্বালার মতোই এ অপমান অগ্নিস্পর্শী, অসহ।

ছট্‌ফট ক'রে উঠলেন। একটা অব্যক্ত অথচ মর্মান্তিক যন্ত্রণার অস্ফুট গোঙানি শব্দ বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

পরাজিত আহত হয়ে পালাচ্ছিলেন—একটু তখনকার মতো আশ্রয় ও বিশ্রাম নেবার মতো স্থানের সন্ধানে—যাতে অল্প কিছুক্ষণও বিশ্রাম নিতে পারেন এই আশায়, তেমন কোন নিভৃত আশ্রয়ের খোঁজে—

'অমন, অমন করছ কেন? কষ্ট হচ্ছে খুব? কি চাইছ? জল?'

অজানা ভাষা। এখানকার কথ্য ভাষা এখনও ভাল ভাবে আয়ত্ত হয় নি ওসমান খাঁর। সবে শিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

তবে মেয়েছেলের গলা। আর বড় মধুর। সুশ্রাব্য সঙ্গীতের মতো তা কানে গিয়ে বাজল।

আবার চোখ চাইলেন। এবার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এসেছে।

প্রথম প্রভাতের অরুণাভা এসে পড়েছে কুটিরের মুক্ত দ্বার-পথে। আর সেই আলোতে বালার্কদ্যুতি-রঞ্জিত এক চিত্র চোখে পড়ল। অপরূপ এক দৃশ্য। একখানি মুখ।

বালিকা বা কিশোরী সে সব ভাবার সময় সেটা নয়।

কোন্ দেশীয়া—তাও নয়।

শুধু চোখ দিয়ে গিয়ে যে বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছল তা এই—এমন কখনও দেখেন নি। এমন একটি ছবি চোখে পড়বে বলে মনেও করেন নি কখনও।

তবে কি তিনি মরেই গেছেন?

অথবা মরেই গিছলেন, বহু শতাব্দী, বহু যুগ পরে আজ রোজ কিয়ামতের দিন বেহেস্তে এসেছেন? তাঁকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন স্বয়ং খুদার ইচ্ছা এই হুরীর মূর্তি ধরে?

কাফেররা কি একেই দেবদূতী বলে?

এক লহমা মাত্র—তার মধ্যেই এতগুলি সাবিস্ময় চিন্তা ও প্রশ্ন খেলে গেল মাথা দিয়ে। তারপর ক্লান্তিতে বিহ্বলতাতে আবারও চোখ বুজলেন।

তার সঙ্গে সঙ্গেই কানে গেল বেহেস্তের সঙ্গীতের মতোই সেই কণ্ঠস্বর—

'তুমি অমন করছ কেন? বল না কি চাই। জল চাইছ? খাবে কিছু? খিদে পেয়েছে?'

এবার ভাল ক'রে চাইলেন ওসমান।

প্রশ্নর দু' একটা শব্দ বুঝতেও পারলেন। এ অঞ্চলের গ্রাম্য কথা ভাষা।

কিন্তু এ কি দেখলেন তিনি। অয়্ খুদা, এ কি দেখালে!

সুন্দরী মেয়ে তিনি অনেক দেখেছেন। পাঠানের ঘরের মতো সুন্দরী আর কোথায় আছে? তাঁর এই দুর্দিনেও তাঁর হারেমেতে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। মুখ চোখ নাক রঙ—এসব বিচারে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও আছে কেউ কেউ।

কিন্তু এ অন্য জিনিস। এ অনন্য। এমন কখনও দেখেন নি। এর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। সাধারণ নিয়মে তুলনা দেবার মতো নয় এ।

এ সুন্দরী নয়, কুৎসিত নয়। এ পুরুষ কি নারী, বালিকা কি যুবতী—এসব কোন প্রশ্নই এর সম্বন্ধে ওঠে না।

একে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন শান্ত আনন্দ-পূর্ণ হয়।

এ নয়নাভিরাম। এ অপরূপ। এ আশ্চয।

যেন এ প্রভাতের আলো থেকে মূর্তি ধারণ করেছে। রক্তমাংসের মানুষ নয়। এই আলো আর চারিদিকের মধু-গন্ধে বাতাস থেকে ফুটে উঠেছে একটি ফুল।

দেহহীন কোন ফুলের নামহীন লাবণ্য।

এমন সুন্দর শুধু নয়—এমন নির্মল, এমন নিষ্পাপ, এমন পবিত্র তিনি আর কিছু দেখেন নি।...

মেয়েটি উঠে গিয়ে একটা ছোট চুম্‌কি ঘটি ক'রে জল নিয়ে এল। তারপর সযত্নে ওঁর গলার নিচে একটা হাত দিয়ে মাথাটা ঈষৎ তুলে ঘটিটা মুখে ধরল।

ঘাড়টা তুলতে ব্যথা লাগল বৈ কি। তবু মনে হ'ল এমন বেদনা জন্মজন্মান্তর বোধ করলেও কোন ক্ষতি নেই।

ওসমান অনেকটাই জল পান করলেন। তৃষ্ণা অবশ্যই পেয়েছিল। তবে সবটাই জলের পিপাসা নয়। এমন পরিবেশে এমন স্পর্শে—এমন এতাবৎ অনাস্বাদিত মমতা উপভোগ করতে—সারা জীবন ধয়ে এই কষ্ট ভোগ করতে প্রস্তুত তিনি।

সুলতানের ঘরে তাঁদের জন্ম—জন্মের পর মা স্তন দেন না। বোন মা বৌদি —এসব সম্পর্কের স্নেহমাধুর্য কি জিনিস তাঁদের ঘরে কেউ জানে না। রাজনীতি যুদ্ধ লোভ লালসা এই জানেন, নারী উপভোগ্যা—অর্থের জোরে, ক্ষমতার জোরে, পদবীর জোরে তাদের উপভোগ করতে হয়। ভালবাসে কি না, ভালবাসা বলে কিছু আছে কি না, কেউ জানে না তাঁদের কৃত্রিম জীবনযাত্রায়।

এ বেদনা সহ্য করতে তাই প্রস্তুত বললে ঠিক বোঝানো যায় না—তিনি উৎসুক।

তৃষ্ণাও পেয়েছিল, শরীরে জলের প্রয়োজন ছিল।

জলপান শেষ হ'তে আবারও কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজলেন। তার কিছু পরে যখন চোখ খুললেন তখন দৃষ্টি ও চিন্তা দুইই আরও স্বচ্ছ হয়ে এসেছে।

কুটির, তার সামান্য তুচ্ছ আসবাব তৈজস দেখে বুঝলেন এ অঞ্চলের কোন আরণ্য গ্রামে আশ্রয় পেয়েছেন।

এদের বৈভব নেই—হৃদয় আছে।

কিন্তু এলেন কি ক'রে? কে নিয়ে এল? যে নিয়ে এল সে গেল কোথায়?

মনে পড়ল তিনি এগিয়ে গিয়ে দল-ছাড়া হয়ে পড়েছিলেন, সঙ্গীসাথীরা কেউ কাছে ছিল না।

শেষ যে স্মৃতি মনে পড়ল—তিনি ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন।—

সঙ্গে সঙ্গেই আসমানীর কথা মনে পড়ে গেল।

আবারও ব্যাকুল হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

আপুচি বুঝল। ইনি যে তার ভাষা বুঝতে পারছেন না, তাও।

সে হঠাৎ উঠে হামা দেবার মতো ভঙ্গীতে বসে হাত পা তুলতে আর ফেলতে লাগল—ঘোড়ার অনুকরণে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ঘোড়া, আসমানী। সে কোথায়? এখানে আনল কে?'

ঘাড় নেড়ে আশ্বাস দিলে আপুচি। সে আছে, ঠিক আছে।

আঙুল দিয়ে বাইরেটা দেখিয়ে দিল। ঐখানে আছে। তারপর হাত মুখ তুলে নামিয়ে বোঝাল সে খাচ্ছে।

'এখানে আমাকে আনল কে? সে গেল কোথায়?'

আস্তে আস্তে, শব্দ মনে ক'রে ক'রে এ অঞ্চলের ভাষা যেটুকু আয়ত্ত করেছিলেন তাইতেই প্রশ্ন করলেন ওসমান।

আপুচিও বুঝল—কিছুটা বা শব্দার্থে—কিছু বা অনুমানে।

সেও ধীরে ধীরে ওকে বুঝিয়ে দেবার মতো ক'রে বলল, 'কোন মানুষ আসে নি

সঙ্গে। ঘোড়া—ঐ ঘোড়াই খবর দিয়েছে।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন ওসমান।

মেয়েটি ওর কথাটা ঠিক বুঝেছে তো ?

আপুচি আবারও বলল, 'হ্যাঁ, ঘোড়াই খবর দিয়েছে।'

'ঘোড়া ? ঘোড়া খবর দিল কি ক'রে ?' বিশ্বাস হ'তে চায় না ওসমানের। নিশ্চয় কোথায় কি গোলমাল হচ্ছে এই কথাবার্তায়।

বুঝিয়ে দিল আপুচি। আস্তে আস্তে একটা একটা ক'রে শব্দ উচ্চারণ ক'রে বুঝিয়ে দিল—ঘোড়ার সে কি অস্থিরতা ; আসছে, ডাকছে এদের, ইশারা ক'রে জঙ্গলের দিকে যেতে বলছে। তারপর কেমন ক'রে এদের অসুবিধা বুঝে পা মুড়ে নিচু হয়ে প্রভুর অচেতন দেহটা তুলে নিল—তাও।

স্নেহে, আনন্দে. কৃতজ্ঞতায়—প্রায় আজীবন-কঠোর যোদ্ধা ওসমানের চোখও জলে ভরে এল।

॥ ৩ ॥

উঠে বসতে আরও চার পাঁচ দিন লাগল। ওঁর গলার আওয়াজ পেয়ে আসমানী মুক্ত দ্বার-পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, ওসমান বলেছিলেন, 'সাবাশ বেটি। তোর জন্যেই আমি জান ফিরে পেলাম। একথা কখনও ভুলব না।'

সেইখানে বসেই ওসমান বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আপুচিকে—ঘোড়ার সাজ কেমন ক'রে খুলতে হয়, কি ভাবে দলাই-মলাই করতে হয়।

এদের খাদ্য সামান্য। ভাত আর কিছু শাক-সব্জী। মাংসর কোন ব্যবস্থা করতে পারলেও—ঝলসানো বা সেদ্ধ করা মাংস।

দুধ-ভাত বা দই-ভাতের ব্যবস্থাও আছে, টক দই।

ওসমান এদের অবস্থা বুঝে যা পেতেন নীরবে তাই খেতেন।

বিশেষ আপুচি ধরে বসিয়ে দিয়ে নিজে হাতে খাইয়ে দিত—তাতেই তো খাদ্যের স্বাদ যেত বদলে।

রান্না করত ঢুলঙ্। আপুচি ভিন্ন দেশের, ভিন্ন জাতের লোককে ছুঁয়েছে, তার সেবা করছে, তাকে খাইয়েছে—তাকে যে ঢুলঙ্ হাঁড়িকুড়ি ছুঁতে দেবে না এ তো জানা কথাই।

অথচ এরা যে ঠিক বর্ণাশ্রম শব্দ বোঝে বা মেনে চলে তাও না। এদের কি জাত, ব্রাহ্মণ কি শূদ্র এসবের মধ্যে পড়ে কি না—সে কথাও বলতে পারবে না। এমন কি এরা যে ঠিক হিন্দুই তাও এদের আচার-আচরণ থেকে বোঝা যায় না।

এখানকার আদিম অধিবাসী এরা। স্বভাব-গৌর বর্ণ, পীতাভ--কোমল দেহ। চোখ আয়ত নয়, আপাত দেখলে মনে হয় দৃষ্টি ভাবলেশহীন কিন্তু যে কোন আঘাতে সে চোখে আগুন জ্বলে ওঠে, ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

মাংস খায়। মানে এই পাহাড়ী জঙ্গলে যা পাওয়া যায়। শজারু, খরগোশ, পাখী, গোসাপ। হাতের কাছে যখন যা পাওয়া যায়।

তবু এদের এই নামহীন সমাজের গণ্ডীর বাইরের কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করলে কোন মেয়ের বাপের বাড়ির দাওয়ায় ওঠার পর্যন্ত অধিকার থাকে না।

সে মেয়ে যদি চায়, পুরুষ যদি রাজী থাকে, ওরা ঘর-কন্না করতে পারে। মেয়ের বাবা ঘর বেঁধে দেবে, সম্ভব হলে কিছু জমি কি গরু ছাগল দেবে—যাতে ওদের

সংসার চলে। আসবে, খবর নেবে—কিন্তু বাবা মা সে মেয়ের ঘরে ঢুকবে না, মেয়েকেও বাবা-মার ঘরে ঢুকতে দেবে না।

আপুচিও তা জানে। জেনেই সে ওঁর সেবা করেছে, করছে।

সেদিন ও দীর্ঘদেহ সুন্দরকান্তি অচেতন মানুষটাকে ভাগ্যের হাতে, বা আরও বাস্তবে নেমে এলে শিয়াল কুকুর বাঘের হাতে ছেড়ে দিতে পারে নি। নিজের কথা ভাবে নি। অবসরও পায় নি।

এখনও তো প্রাকৃতিক কাজগুলো করিয়ে দিতে হচ্ছে।

এটা যে দিন বুঝতে পারলেন ওসমান—বুদ্ধিমান ওসমানেরও বুঝতে পাঁচ-সাত দিন সময় লাগল—তখন যেমন কৃতজ্ঞতারও শেষ রইল না, তেমনি চিন্তিতও হয়ে উঠলেন এই নব-জীবনদাত্রী মেয়েটির ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে।

এত সুন্দর, এত সরল, করুণাময়ী মেয়েটি।

এর কি জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

তবু সকল দেশের সকল মানুষের কাছেই সব চেয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে নিজের ভাগ্য, ভবিষ্যৎ ; নিজের সংসার, নিজের জীবন।

ওসমানেরও সেই চিন্তা সকল চিন্তা ছাপিয়ে মাথা তুলবে, এই তো স্বাভাবিক।

তুলঙ-এর পাতা-লতার রসে ক্ষতগুলো দ্রুত শুকিয়ে চামড়া পুরে উঠতে লাগল। এবং ভাতে যত না হোক—এরা ভাত আর মধু পচিয়ে একরকম পানীয় তৈরী করে—তাতে আরও পুষ্টি ও শক্তি লাভ করলেন।

ছ'সাত দিনেই আপুচির কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে এলেন।

ক্লান্ত দুর্বল শরীর, তবু বহুক্ষণ ধরে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

চিনতেও পারলেন কিছু কিছু জায়গা।

বুঝলেন বোকাই থেকে বেশীদূর আসতে পারেন নি। এ তাঁর জমিদারী বা রাজ্যের এলাকার মধ্যেই পড়ে। তবে জনবিরল পার্বত্য স্থান, কৃষির উপযুক্ত স্থান নয় বলেই এসব জায়গা নিয়ে তত মাথা ঘামান নি।

অথবা সময়ও পান নি।

এদের শাসন করবেন কি জন্যে ? এখানে নিজের অধিকার বিস্তারে চিন্তা ব্যয় করবেন কিসের আশায় ? এখানে আশা করার মতো কি আছে ?

এসব স্থানে কৃষি বা বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা না করলে কর আদায়ের কোন সম্ভাবনা নেই।

সে বহু সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ।

সে সব প্রশ্ন পরে। নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় না করালে এসব কথা ভাববেন কখন ?

বাস্তব যা—বোকাই দখলের সঙ্গে সঙ্গে এসব মুঘল-এক্তিয়ারে চলে গেছে। তবে যে কোন কারণেই হোক ইসলাম খাঁ ওসমানকে তখনই ধরার জন্যে খুব বেশী চেষ্টা করেন নি।

কিন্তু সে সব খবর কে দেবে? ওঁর আত্মীয়স্বজন বিশ্বস্ত অনুচর তাদের যুদ্ধের পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন—ভাগ্য যদি বিমুখ হয় তারা যেন শ্রীহট্টর দিকে চলে গিয়ে বায়াজিদ কররাণীর রাজ্য-সীমায় আশ্রয় নেয়।

এত সহজে শ্রীহট্ট আক্রমণ করবেন না ইসলাম খাঁ। সে ঢের বেশী দুর্গম। এদিকের ঝঞ্ঝাট না মিটিয়ে ওদিকে যাবেন না।

তবে সে বহু দূরও এখান থেকে। ওঁর কোন খবর না নিয়েই অনুচরসঙ্গীরা সকলে চলে যাবে।

রাজধর্মে কৃতজ্ঞতা প্রয়োজন—খুবই প্রয়োজন—তবে তাঁর চারপাশে যারা থাকে বা আছে, জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যাদের নিয়ে ঘর করছেন, তাদের দেখে, বহু কাহিনী শুনে যা বুঝেছেন—আত্মীয়তার ধর্মপালন কি কৃতজ্ঞতা—খুবই দুর্লভ। তাদের দাপটে রাখলে তারা পা মুছিয়ে দেবে দশবার, সে দাপট দুর্বল হয়ে উঠেছে বুঝলেই পিছন থেকে ছুরি মারবে। শয্যার মধ্যেকার সাপের মতোই সাংঘাতিক তারা।

তবে, সে কারণেও ওঁর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত বা নিশ্চিত হওয়া দরকার। ওসমান খাঁকে তারা বিলক্ষণ জানে। বেঁচে থাকলে যে কোন অবস্থা থেকেই মাথা তুলবে আবার—সেক্ষেত্রে বোঝা-পড়াটা কি প্রকার হবে তাও তারা জানে।

তবে? এই অরণ্যে খুঁজে পাচ্ছে না ?

তেমন গহন অন্ধকার বনও তো নয়। পাহাড়ে জমি, আগাছা বা তৃণবহুল জঙ্গল খুব কমই।

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ভেতরে এসে আবার ধীরে ধীরে শুয়ে পড়েন সেই অদ্বিতীয় শয্যাতেই।

ওসমান মুখে কিছু না বললেও আপুচি যেন নিজের হৃদয়ের আকুলতা দিয়ে বুঝতে পারে ওঁর মনোভাব।

কাছে এসে গায়ে হাত রেখে বলে, 'কি ভাবছ? আত্মীয়স্বজনদের কথা? যুদ্ধের কথা? শত্রু কত দূরে? কতটা এগোল?…খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে, না?'

মনটা নিজের ভাগ্যচিন্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে এই কিশোরী মেয়েটির বক্তব্যের দিকে দিতে কিছু দেরি হ'ল। তারপরই ওর সেই ফুলের চেয়েও নরম হাত একটা চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ। ভাবছি কোথায় ছিলাম, কোথায় এসে কি ভাবে পড়লাম। এখানে এই যে পড়ে আছি সে খবর কি ভাবে দেব, কোথায় কাকে দেব, কি ভাবে আবার শক্তি সঞ্চয় করব—এই সব কথাই। তবে কষ্ট হচ্ছে খুব সে কথা একেবারেই ঠিক নয়। জীবনে আমি এমন সুখ ভোগ করি নি কখনও। এমন সেবা এতখানি স্বার্থত্যাগ কারও কাছ থেকে পাই নি, দেখিও নি। কোন পুরস্কারের আশা না রেখে, প্রতিদানের কথা না চিন্তা ক'রে, নিজের ভবিষ্যৎ না ভেবে যে কেউ এমন করতে পারে—এমন অবিশ্বাস্য কথা কারও কাছ থেকেই শুনি নি। কে জানে, ঐ ভাবে পড়ে আছি দেখলে আমাদেরই দলের কোন সর্দার হয়ত আমার গলাটা কেটে আমার সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে দখল করার চেষ্টা করত।'

'তবে আর ওদিকের কথা ভাবছ কেন? এখানেই থেকে যাও, দাদা জমি দেবে, ঘর ক'রে দেবে; আমি তোমায় সেবা করব—আমি খেটে এনে তোমাকে খাওয়াবো। এখানে ওসব লড়াই নেই, হানাহানি নেই। অনেক দিন তো খাটলে, এবার একটু আরাম করো।'

'তুমি একটা এই আধ-বুড়ো লোকের জন্যে জীবনটা নষ্ট করবে?'

খুব খানিকটা হাসে আপুচি, তারপর বলে, 'ওমা, সে যা হবার সে তো হয়েই গেছে, সেই প্রথম দিনই। তুমি কি ভাবছ দাদা আমাকে এ ঘরে থাকতে দেবে? না আমার হাতের রান্না খাবে কোন দিন? সেদিন তো সে কথা ভাবি নি, কেমন ক'রে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলব শুধু সেই কথাই ভেবেছি।'

'কেন আপুচি, তুমি তো আমাকে তার আগে কখনও দেখ নি। আমার কথাও কখনও শোন নি কারও মুখে। আমি কে তাও জানতে না, তবে কেন এমন অনিষ্ট ক'রে বসলে নিজের?'

'তা জানি না, তা ভেবে দেখারই বা অবসর পেলাম কোথায়? সে সময় কি তখন ছিল। রক্ত বেরিয়ে বেরিয়ে দেহের কি অবস্থা হয়েছিল? তবে তুমি আমার কথা ভেবে মন খারাপ ক'রো না। ভাল লাগে থাকো, না লাগে সেই তাদের মধ্যে ফিরে যাও।'

'তার পর? তোমার কি হবে?'

'তা এখন থেকে জানব কেমন ক'রে। আগে যখন ভাবি নি, এখনই বা সে

কথা ভাবতে বসব কেন ?'

ওসমান স্তব্ধ হয়ে যান। এই এক ফোঁটা মেয়ের মনের যেন তল পান না।

পূর্ব জীবনের খেই ধরা আবার—যা এ ক'দিন একেবারেই অসম্ভব বোধ হচ্ছিল—তা সম্ভব হ'ল বলতে গেলে আসমানীর দৌলতেই।

সুস্থ হয়ে ঘোড়ায় জিন কষে যদি বা রওনা হন—কোথায় কোন দিকে যাবেন এ ক'দিন এই ছিল ভাবনা। শ্রীহট্ট বহু দূরে। সেও একটুখানি জায়গা নয়। তার কোন্ প্রান্তে তার দল আশ্রয় নিয়েছে তাই বা কেমন ক'রে জানবেন ? একা এই শরীরে যাবেনই বা কোথায় ? কেবলই বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবেন ? অর্থও তো কিছু সঙ্গে নেই।

দুটো দিনরাত চিন্তার গভীরে ডুব দিয়েই কাটল। তৃতীয় দিন কিছু বেলায় অকস্মাৎই ঘরের সামনের মাঠে একাধিক অশ্বখুরের শব্দ উঠল।

চকিতে তরবারিটা টেনে নিলেন ওসমান খাঁ।

প্রথমেই মনে পড়া স্বাভাবিক মুঘলদের কথা।

তবে কি দুশমনই খবর পেল শেষ পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে মরতে যদি হয়, কয়েকজনকে ঘায়েল ক'রে মরাই ভাল। ওদের হাতে বন্দী হয়ে লাঞ্ছনা সহ্য করবেন না কোনমতেই।

তবে অত কিছু ভেবে হাতিয়ারে হাত দেন নি।

ওটাই অভ্যাস—তা থেকে স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

বেরিয়ে দেখলেন যে দশজন নয়—মাত্র চারজন এসেছে, এবং তাঁরই দলের লোক। প্রিয়, বিশ্বস্ত অনুচর।

সর্দার ইব্রাহিম খাঁ, কাশেম, আঘা, খুশরু।

একজন বন্ধু-স্থানীয়, বাকী তিনজন আত্মীয়।

ওকে দেখে তারা আনন্দে কলরব ক'রে উঠল। ওসমানও নেমে এলেন দাওয়া থেকে। আলিঙ্গনের পর তিনিও সেই মাঠে ঘাসের ওপর বসলেন, ওদেরও ইঙ্গিত করলেন বসতে। ঘরে স্থান হবে না এত লোকের। মাঝখান থেকে ঐ বৃদ্ধ ও বালিকাকে বিব্রত করা।

না, তারা কেউ এ অঞ্চল ছেড়ে যায় নি। বড় দল একটা চলে গেছে এটুকু তারা জানে—তবে সবাইকার খবর বলতে পারবে না। যারা গেছে তাদেরও বায়াজিদ কররাণীর রাজ্য-সীমায় ঢোকার প্রয়োজন হয় নি। ওসমানেরই সীমানার

উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে। যাতে প্রয়োজন হলেই শ্রীহট্টের এলাকায় চলে যেতে পারে।

যাবার প্রয়োজনও হয় নি। যে কোন কারণেই হোক ইসলাম খাঁ বোকাই-এর দুর্গ দখল ক'রে ক'দিনের মধ্যেই আবার জাহাঙ্গীর নগরে ফিরে গেছেন বোধ হয়।

যা শোনা যাচ্ছে, তা যদি নিছক গুজব না হয়—ওদিকে প্রতাপাদিত্য প্রমুখ কয়েকজন ভুঁইয়া আবার মাথা তুলেছেন।

প্রতাপাদিত্য নিজে এসে বশ্যতা স্বীকার ক'রে সর্বতোভাবে মুঘলদের সাহায্য করবেন এই অঙ্গীকারে, ছোট ছেলেকে প্রতিভূ রেখে সন্ধি করেছিলেন।

তবে এই তুচ্ছ অঙ্গীকার মেনে চলবেন, প্রতাপাদিত্য তেমন পাত্র নন। ইসলাম খাঁর নিশ্চিন্ততার অবসরে হঠাৎ এসে পড়ে বরং মুঘলদের নৌবাহিনী নষ্ট ক'রে দিয়েছেন—এ কথাও বলছে কেউ কেউ।

'তা তোমরা আমার খোঁজ পেলে কি ক'রে?'

প্রাথমিক সংবাদ-বিনিময়, সৌজন্য ও প্রীতির আদান প্রদান শেষ হলে ওসমান খাঁ প্রশ্ন করলেন।

'আমরা কোন খোঁজই পাই নি। কে খোঁজ দেবে? এরা না বোঝে আমাদের ভাষা, আমরা না বুঝি ওদের কথা। তা ছাড়া মানুষই বা ক'জন এখানে? যারা দুচার জন আছে দূর থেকে আমাদের দেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাচ্ছে। তবে আমরা জানি, আপনি যে রকম জখম হয়েছিলেন—এখান থেকে বহু দূরে কোথাও যেতে পারেন নি। আমরা ষোল-সতেরো জন চার ভাগ হয়ে এই অঞ্চলের পাহাড়-জঙ্গলটায়, এদেশে যেমন মাছ ধরার জন্যে জাল ফেলে তেমনি ভাবে ঘিরে মাঝের দিকে এগোচ্ছিলুম। আমাদেরও দুরবস্থা কম নয়, যা পাচ্ছি, তাই খাওয়া, মাঠে গাছতলায় পালা ক'রে শোওয়া। আজ হঠাৎ দূর থেকে ঘোড়া দেখেই মনে হ'ল আপনি নিশ্চয় এই কাছাকাছি আছেন কোথাও। এগিয়ে আসতে আসমানীকে চিনতেও পারলুম। ও ই আমাদের দেখা মাত্র আগে আগে চলে ঠিক এই এইখানে এসে থামল।'

কাশেম বলল, 'একেবারে মানুষের মতো বুদ্ধি বেটির।'

অর্থাৎ হাওয়া অনুকূল।

যা শুনছেন তা যদি সত্য হয়, ইসলাম খাঁ অন্তত কিছুকাল এদিকে আসতে পারবেন না, ততক্ষণে, বায়াজিদ যদি কিছু আনুকূল্য করে···উনি আবার শক্তিসঞ্চয় ক'রে নিতে পারবেন।

আশায় আর উৎসাহে ওসমান খাঁ উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন।

বায়াজিদ নিজের স্বার্থেই ওঁকে সাহায্য করবেন। উনি যতক্ষণ আছেন মুঘল আর কররাণীদের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকবে। সৈন্য যারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—উনি বেঁচে আছেন সুস্থ আছেন শুনলেই ছুটে আসবে।

এতদিনের অন্ধকার এক নিমেষে কেটে গেল।

ষোল-সতেরো জন তো এইখানেই আছে, একদিনের মধ্যেই গিয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে পৌছতে পারবেন।

এ ক'দিন নিষ্ক্রিয়তাটাই পীড়া দিচ্ছিল সব চেয়ে বেশী।

উনি যেন এখনই অস্ত্রের ঝনৎকার ও রণক্ষেত্রের কোলাহল কানে শুনতে পাচ্ছেন। যে বারো বছর বয়স থেকে যুদ্ধ করছে—বাংলা, উড়িষ্যার এক স্থান থেকে আর একস্থানে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছেন বিতাড়িত হয়ে হয়ে—তবু মাথা নত করেন নি—তার কাছে রণবাদ্যই তো মহৌষধি।

এখানের এই কর্মহীন, জটিলতা-হীন, দ্বন্দ্ব ও জীবনযুদ্ধহীন নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন, অপরিসীম দৈন্যর মধ্যে কোনমতে দিনরাত্রি গণনা ক'রে যাওয়া—এ তো জীবন্ত সমাধি। কিন্তু—

এই কিন্তুটাই সর্বাধিক সুকঠিন সমস্যা। আপুচির কাছে বিদায় নেওয়াই। তবে তা তো একদিন করতেই হবে।

ঘরে ঢুকে দেখেন আপুচি একটা মাটির বড় পাত্রে ভাত আর খানিকটা খরগোশের মাংস ঝলসানো, তার সঙ্গে কিছু চুপড়ি আলু পোড়া সাজিয়ে রেখেছে। পাত্রটা ওঁর সামনে ধরে বলল, 'বাইরে নিয়ে যাও—ভাগ ক'রে খাও গে। আবার কখন কোথায় কি জুটবে তার তো ঠিক নেই।'

শান্ত কণ্ঠস্বর—ভাবলেশহীন মুখভাব। তিনি যেন কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন। জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'তা তো হ'ল—কিন্তু—'

আপুচি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলল, 'ঐ মাটির কলসীটাই বার ক'রে দিচ্ছি, আর এই জলের ঘটিটা—তাতেই সবাই জল খেয়ে নাও। দাদা আর বাসন দেবে না।'

ওসমান তখন আর কথা বাড়ালেন না। আহারের পাত্র আর জলের কলসী বাইরে এনে নামিয়ে দিলেন। তারা যে উল্লাসধ্বনি ক'রে উঠল তাতে বোঝা গেল—এ ক'দিন এমন খাদ্যও জোটে নি। আহারের পালা শেষ হলে কাশেম আসমানীকে সাজ পরাতে লাগল।

ওসমান ঘরে ঢুকে এবার আর কোন ভূমিকা করলেন না। একেবারে আপুচির

হাত দুটো ধরে বললেন, 'আমাকে তো যেতেই হয় এবার। তুমি—তুমি কি কোনমতে আমার সঙ্গে যেতে পারো না?'

'কেন পারব না। তুমি বললেই যাবো। তুমি তো বলো নি যেতে।'

সরল উত্তর, সহজ কণ্ঠস্বর। আবারও একটা ধাক্কা খেলেন ওসমান। বিস্ময়! বিস্ময়! অপরিমাণ বিস্ময় এই এতটুকু মেয়েটার মধ্যে।

'বলতে সাহস করি নি আপুচি। এই তো আমার অবস্থা। জানি না ভাগ্যে কি আছে। হয়ত পরের যুদ্ধেই প্রাণ হারাতে হবে। তখন তোমার কি হবে? এর মধ্যে তোমাকে টেনে নিয়ে যাব—সেই যে ভয় করে বড়। বেগমরা, আমার হারেমের অন্য মেয়েরা কে কি রকম ব্যবহার করবে—। আমার সঙ্গে দেখাই হবে হয়ত কদাচিৎ, যুদ্ধের আয়োজনে ঘুরে বেড়াতে হবে—তুমি কি সে নিঃসঙ্গ জীবন সইতে পারবে?'

'এখানেই বা আমার কে থাকবে, কি থাকবে? তুমি চলে গেলে আমি একা। এখানের কেউ আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে না। বড় জোর দাদা আমাকে একটা আলাদা ঘর তৈরী ক'রে দেবে। তার পর? বিয়ে করবে না কিন্তু অত্যাচার করার লোক অঢেল। সেখানে যদি কখনও কখনও এক-আধবারও দেখা পাই, সেও আমার লাভ। দিনরাত তুমি আমার কাছে থাকবে সে আশা করবই বা কেন! ক'দিনেই তোমাকে চিনে নিয়েছি—তুমি কাজ-পাগল, যুদ্ধ-পাগল লোক। রাজা হয়ে বহু লোককে শাসন করবে—এ-ই ভেবেছ চিরকাল। তুমি থেকো তোমার কাজ নিয়ে—ওরই মধ্যে যদি কোন দিন একটু সেবা করতে পারি—সে-ই আমার অনেক পাওয়া।'

ওসমান আনন্দে আবেগে—আজ এই প্রথম, ওকে জড়িয়ে ধরে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'তাহ'লে কি তুমি আমাকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছ? কিন্তু কি দেখে ভালবাসলে পিয়ারী, আমি যে তোমার চেয়ে অনেক বড়—বয়সের অনেক ফারাক আমাদের। আমার বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে। আমার মধ্যে কি দেখলে তুমি? রাজ্যভ্রষ্ট, ভাগ্যতাড়িত—সেদিকে দিয়েও তো আমাকে কামনা করার কিছু নেই। তবে?'

'তা তো জানি না। সে প্রথম দিনও কিছু ভাবি নি, তার পরও না। যা হবেই, যা হয়ে গেছে—তা নিয়ে আর ভেবে লাভ কি? তোমাকে ভাল লেগেছে এই জানি। আমি যে তোমার কাছ থেকে ভালবাসা পাবো তাও আশা করি না। সে-সব হিসেব নিয়েও তো মাথা ঘামাই নি।'

'ভালবাসা! আজ মনে হচ্ছে যে মরীচিকার পিছনে ছুটছি তা যদি কখনও

সত্য হয়—জীবনে সুখ-শান্তি কি পাবো? জীবনে ভোগ করবো কবে? বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক, কোন একটা জায়গায় গিয়ে তোমার মতো কোন মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধলে—যে শুধু ভালবাসবে কিছু প্রত্যাশা করবে না তার বদলে—সুখ না হোক, শান্তি আর আরাম পেতাম।'

'না, সে তুমি থাকতে পারতে না। এরা আসার পর যেভাবে তোমার মুখ চোখের চেহারা পালটে গেল—তাতেই বুঝেছি। ভালবাসার ঘর বাঁধা তোমার সইবে না। আর এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না···আমাকে নিয়ে যেতে চাও, চলো, আমি যাচ্ছি।'

'এই ভাবে? এখনই?'

'আর কি ভাবে যাবো। আর কি আছে আমার?'

'আমি আজই গিয়ে সেখানে পৌঁছে নিকাহ্ মানে বিয়ে করবো আপুচি।'

'না, থাক, কী দরকার, তুমি একজন দাসী নিয়ে যাচ্ছ এই পরিচয়ই থাক না। তোমার কি ধর্ম, তোমাদের বিয়ে কেমন তাও আমি জানি না—ওর কি দাম তাও না। তোমাকে একদিনও যদি নিজের ক'রে পাই—সেই আমার ঢের। আমার জন্যে তুমি পিছু ফিরে তাকিও না। নিজের পথে যেয়ো।'

প্রবল বাধা দিল তুলঙ্।

'তুই ওর তরে ঘর, দেশ, ভুঁই ছেড়ে কোথাকে যাবি। সেখানে গিয়ে তোকে চিনতে পারবে ও? ঝি হয়ে থাকতে হবে। তুই তাদের কাছে গেঁয়ো ভূত—সেখানের দাসীরাও তোকে লাথি মারবে।'

শান্তভাবেই বলে আপুচি, 'এখানেই বা কি নিয়ে কার ভরসায় কোথায় থাকব বল্! এখানে কে আমাকে কি রাজসুখে রাখবে? তুই যতদিন আছিস হয়ত দুটি খেতে দিবি। তার পর? হয় জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে একদিন বাঘের পেটে যেতে হবে, নয় তো কেউ ধরে নিয়ে কোন দূর দেশে বেচে দেবে, হয়তো এই এদের ঘরেই বেচে দেবে। আমাকে নিয়ে কি কেউ আর এখানে ঘর বাঁধবে?'

'তা না-হয় বেয়েচেয়ে দেখতাম। জমি জায়গা ঘর সব দিব জানলে হয়তো কেউ রাজী হয়েও যাবে।'

'না, সে অনেক দূরের কথা। একে আমি মন দিয়েছি। দাসীগিরি যদি করতে হয় এরই করব।'

সে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তেই গিয়ে ওসমানের সঙ্গে আসমানীর পিঠে চেপে বসল।

|| ৪ ||

সৌজন্য বা ভদ্রতা খুবই ভাল জিনিস এ পৃথিবীতে। চিরদিনই মার্জিত-রুচি শিক্ষিত ব্যক্তিরা তা স্বীকার করেছেন—হয়ত করবেনও।

তবে তা কি সব সময় নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করা যায়?

বিশেষ যদি তা স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়িয়ে অতিরিক্তের দিকে যায়?

দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যদি দেখা যায় দাতা অধিকতর সৌজন্য প্রকাশে উৎসুক ও ব্যস্ত—গ্রহীতা, যদি তার কিছুমাত্র সাংসারিক জ্ঞান থাকে তো সন্দিগ্ধ বা শঙ্কিত হয়ে উঠতে বাধ্য—তা মহাপুরুষরা যাই বলুন না কেন।*

ওসমান বলতে গেলে আজন্ম ভাগ্যের হাতে মার খাচ্ছেন—অবাস্তব স্বপ্ন দেখার মানুষ তিনি নন, পোড় খেতে খেতে মনের রঙটাই গেছে পালটে, বেশী পোড় খাওয়া হাঁড়ির মতো—সুতরাং অকস্মাৎ বায়াজিদ কররাণীর দিক থেকে অতিরিক্ত সৌজন্য প্রকাশে সন্দিগ্ধ শুধু নন—বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।...

বোকাই-নগর আক্রান্ত হওয়ার প্রাক্কালে ধনরত্ন এবং স্ত্রীলোকদের সরিয়ে ফেলার বেশী সময় পান নি ওসমান।

তার কারণ ইসলাম খাঁর বিচক্ষণতা ও শক্তির মানটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি, হিসেবে ভুল করেছিলেন। ইসলাম খাঁ এই অপরিচিত দুর্গম পথে যে ভাবে দ্রুত অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন—তা অমানুষিক ক্ষমতার পরিচায়ক।

তা ছাড়াও, যাও বা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, তার সব এ দুরন্ত ঘাঁটিতে পৌঁছয় নি। পথে বেশ কিছু খোয়া গিয়েছিল—যার কোন হদিস মেলে নি।

এসব ক্ষেত্রে এমন হয়েই থাকে। চিরকালই হয়েছে, চিরদিনই হবে।

সব রক্ষক কি বাহক ইমানদার হবে এমন আশা করাই ভুল। কিছু চুরি-ডাকাতি হয়, কিছু খরচও হয়। কে কতটা সত্য বলছে আপৎকালে তা নির্ণয় করা কঠিন। সে অবসরও থাকে না।

অনেক সময় কাউকে সন্দেহ হ'লেও, এমন কি নিশ্চিত হলেও বৃহত্তর স্বার্থের মুখ চেয়ে তা প্রকাশ করা যায় না।

* যিনি দান করবেন তিনি নতজানু হয়ে তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাবেন—যিনি গ্রহণ করবেন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তা গ্রহণ করবেন। —স্বামী বিবেকানন্দ

ওসমানের ক্ষেত্রেই বা সে চিরকালীন সত্যের অন্যথা হবে কেন ?

তিনি এ ঘাঁটিতে পৌঁছে দেখলেন এখনও তাঁর যা সৈন্যসংখ্যা আছে (যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল—উনি জীবিত আছেন এবং আবার প্রস্তুত হচ্ছেন সংবাদ পাওয়া মাত্র এসে সমবেত হয়েছে। ওসমানও তা জানতেন, কারণ তখন এই পাঠানদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এমন লোক আর বিশেষ কেউ ছিল না।), তাতে আবার যুদ্ধের—আক্রমণ না হোক আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়।

কিন্তু তার পূর্বে প্রয়োজন তিনটি বস্তুর—অশ্ব, অস্ত্র ও অর্থ।

এর মধ্যে শেষেরটিই প্রধান। ওটা পেলে বাকী সংগ্রহ করতে বিলম্ব হবে না।

এত অর্থ তাঁর ভাণ্ডারে নেই। যেটুকু জনপদের এখনও তিনি মালিক তা শূন্য ক'রে লুঠ করলেও সে-পরিমাণ অর্থ মিলবে না।

তাই তিনি দূতের হাতে সবিনয় পত্র পাঠিয়ে বায়াজিদ কররাণীর কাছে সেই দ্রব্যটিই প্রার্থনা ক'রে পাঠিয়েছিলেন।

সেই সঙ্গে এও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, যতদিন ওসমান সমর্থ ও সশস্ত্র থাকবেন—ততদিনই কররাণীর পক্ষে মঙ্গল। মুঘল ও কররাণীর মধ্যে প্রাচীর বা পরিখার কাজ করবেন তিনি।

সেই পত্রের যে উত্তর এল—তা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অস্বস্তিকর।

বায়াজিদ ওসমান সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রীতি স্নেহ এবং আশ্বাস প্রকাশ করেছেন। খোদার কাছে ওঁর জন্য যে তিনি নিত্যই পাঁচ ওক্ত নামাজের সময় দোয়া ভিক্ষা করেন তাও জানিয়েছেন। অতঃপর লিখেছেন যে তিনি সংবাদ পেয়েছেন ওসমান খাঁ বোকাইয়ের যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হয়েছিলেন, এখন সে ক্ষতগুলি কিছুটা নিরাময় হলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নি, এখনও খুবই দুর্বল। সুতরাং মুসলমান ভাই হিসাবে, জ্ঞাতি হিসাবে, পাঠান হিসাবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি নিজেই আসবেন ওসমান খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং যতটা সম্ভব হাতের জরুরী কাজ মিটিয়ে দ্রুত আসবার চেষ্টা করবেন। তখন বৈষয়িক কথাও আলোচনা হ'তে পারবে।

এ উত্তর পেয়ে স্বভাবতই ওসমানের সংশয় ও আশঙ্কার অবধি রইল না।

এর অর্থ কি ? শব্দার্থর অন্তরালে গূঢ়ার্থ ?

এত দিনের মধ্যে তো কৈ কখনও বায়াজিদকে ওঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত দেখা যায় নি!

আসল উদ্দেশ্যটা কি ?

আসলে কতটা শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে তা দেখতে বা যাচাই করতে চান ? অর্থ কি অন্য সাহায্য দিলে তা জলে পড়বে কিনা।

নাকি দুর্বল দেখলে তিনিই গ্রাস করবেন এটুকুও ?

কিন্তু সেটা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে! মুঘলদের আঘাতের চোটটা তাহলে সরাসরি তাঁর ওপরই পড়বে।

এইসব নানা প্রশ্ন-উত্তরে নিজের মনেই জর্জরিত হতে লাগলেন। বিশ্বস্ত সহচররাও এক একটা সংশয় উপস্থাপিত করতে লাগলেন। কোনটাই নিশ্চিত ক'রে জানা সম্ভব নয় বলেই নানা সংশয়ে কণ্টকিত হতে হয়। একটা বিপদ নিশ্চিত জানলে সর্ব প্রযত্নতায় মোকাবিলা করা যায়। তাতে এত যন্ত্রণা নেই।

তবু যখন আসবেন বলেছেন, তখন রাজ-অতিথির যোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে হবেই।

এখন ওঁরা যেখানে বাস করছেন তাকে কোনমতেই প্রাসাদ বলা চলে না। দুর্গ তো নয়ই।

কয়েকটা মাত্র পাথরের বড় বড় ঘর, মাটির মেঝে, খড়ের চাল। শক্ত বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে পাঁচিল দেওয়া, তার বাইরে একটু পরিখার মতো। আপাতত এইখানেই জেনানারা থাকেন। অর্থাৎ এটাই হারেম।

সর্দাররা যে যার সামর্থ্য মতো এই ধরনের কুঠি ক'রে নিয়েছেন। অন্য রাজ-পুরুষদের বা কুমারদের জন্যে খড়ের চালের ও ছিটেবাঁশের দেওয়ালের ঘর। এদেশী তল্‌তা বাঁশের চালির ওপর মাটি লেপা দেওয়াল। সাধারণ সৈনিকরা খোলা বড় বড় চালার নিচে বাস করছে। তাদেরও সঙ্গে জেনানা আছে। অনেকের সেজন্যে স্বতন্ত্র চালা। কেউ বা এখনও কিছু ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারে নি, তারা তাঁবুতে দিন কাটাচ্ছে।

ওসমানের জন্যে একটা বড় ভাল পাথরের বাড়ি নির্দিষ্ট হয়েছিল বৈকি। ওরই মধ্যে তাঁর শয়নঘর, গোসলখানা, দরবার ঘর, মন্ত্রণাকক্ষ—একটু নামাজের জায়গাও।

কিন্তু দরবার বা মন্ত্রণার সময় সেখানে গেলেও এখানে ফিরে আসার পর বাস করার জন্যে একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিলেন তিনি। এই বাড়ির ঠিক পাশেই একটি চালাঘর বানিয়ে সেখানেই বাস করছিলেন।

বাস করছিলেন তাঁর জঙ্গল থেকে আনা পাহাড়ী বেগমের সঙ্গে। সেইখানেই তাঁর খাটিয়া, সেখানেই আহারের ব্যবস্থা। ঐ বেগম নিজেই রান্না করেন, কোন

বাবুর্চির হাতে খান না, কোন নৌকরকেও কিছু করতে দেন না। সুলতানের যা কিছু সেবা তিনিই করেন, আহার্যও তিনিই প্রস্তুত করেন।

বেগম মহলের প্রধানারা নাক সিঁটকে বলেন, 'বেগম কে বলে ওকে? য়্যাঁ? নিকেও তো হয় নি শুনছি। আসলে বাঁদীই। জনাবালির সেবা করেছিল তাই সঙ্গে এনেছেন। দিনকতক নতুন কচি মেয়ে ভোগ ক'রে নিচ্ছেন। বুদ্ধিমান তাই নিকাহ্ করেন নি, নইলে একটা দায় থাকত, এ যেদিন খুশি লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারবেন।'

তা সে যে যাই বলুক এই মেয়েটি এখনও নিত্য নব বিস্ময় ওসমানের কাছে। অভিজ্ঞ প্রৌঢ় ওসমানও প্রেমের এ তীব্রতা আন্তরিকতা গভীরতা—রমণী সম্ভোগের এই নব বৈচিত্র্য ও সুখ—পূর্বে কখনও দেখেন নি, এর স্বাদও জানতেন না।

মনে হচ্ছে এ যেন নতুন ক'রে বাঁচলেন তিনি, সত্যকারের জীবন উপভোগ শুরু হ'ল তাঁর জীবনে।

আর তার ফলেই যেন তাঁর কাজেকর্মে উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। এক এক সময় মনে হয় পৃথিবী জয় ক'রে এনে সে রাজ্য-সম্পদ এই মেয়ের পায়ের কাছে রাখতে পারলে তবে এ সর্বস্ব সমর্পণ করা প্রেমের পূর্ণ মূল্য দেওয়া হয়।

কাজেই বায়াজিদ কোথায় থাকবেন সেজন্য কোন চিন্তার কারণ রইল না। ওসমান খাঁর মহল তো খালিই পড়ে আছে—ঐটেই একটু সাফসুত্‌রো করিয়ে নিয়ে কিছু কিছু, যতটা সংগ্রহ করা গেল—আরাম করার মতো শয্যা গালিচা প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে প্রস্তুত হ'লেন ওসমান খাঁ।

তাঁর সঙ্গে কিছু সৈন্য-প্রধানরাও আসবেন নিশ্চয়, সে ব্যবস্থাও হ'ল। দেহরক্ষীদের জন্যে বড় দুটো চালাঘর আর কিছু তাঁবু।

বায়াজিদ এলেনও খুব শীঘ্র। এত শীঘ্র আসবেন তাও আশা বা আকাঙ্ক্ষা করেন নি ওসমান।

পত্র পৌঁছবার সাত দিনের মধ্যেই তিনি পৌঁছে গেলেন।

লোকও খুব একটা বেশী আনেন নি, আনলেও দূরে কোথাও রেখে এসেছেন। সঙ্গে মন্ত্রীস্থানীয় দু-তিনজন, সেনাপতি স্থানীয় একজন, আর সাত-আটজন দেহরক্ষী।

এই বিপন্ন অবস্থায় ওসমান না বিব্রত হয়ে পড়েন বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যেই এত কম লোক এনেছেন।

তাও প্রথমটায় এদের জন্য তিনিই আহারাদির ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন, কিন্তু

সে প্রস্তাবে ওসমানের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল দেখে তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন।

প্রথম দিনটা তো কাটল প্রীতি ও সৌজন্য প্রকাশে। আরাম বা বিশ্রামের প্রয়োজন তো ছিলই। দ্বিতীয় দিন তিনি মন্ত্রীদের নিয়ে বসে, ঠিক কতটা শক্তি—অর্থ অস্ত্র এবং লোকবল আছে ওসমানের হাতে, আর কতটা বাড়াতে চান, তার জন্য কতটা ঋণ বা আনুকূল্য প্রয়োজন হবে, তার সবটাই তিনি বায়াজিদের কাছ থেকে আশা করেন কিনা—এ হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নিতে, তা লিপিবদ্ধ করতেই কেটে গেল।

জানলেন তিনি কিন্তু সম্মতি অসম্মতি, আগ্রহ কি ঔদাসীন্য, কী এদের সামর্থ্য সম্বন্ধে সংশয় কিছুই প্রকাশ করলেন না। ওসমান চলে এলে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করলেন। পরের দিন 'নাস্তাপানি'র পর জানালেন দেশে ফিরে গিয়ে নিজের সামর্থ্যটা পুরোপুরি দেখে বুঝে নিয়ে উনি জানাবেন ঠিক কতটা কি সাহায্য তাঁর দ্বারা সম্ভব।

তবে সে উত্তর পেতে দেরি হবে না। আশা করছেন তাঁদের সেখানে পৌছবার পর দিন-তুইয়ের মধ্যেই মনস্থির করতে পারবেন।

এ পর্যন্ত সরকারী অর্থাৎ বৈষয়িক কথার পর বায়াজিদ ইঙ্গিতে নিজের সচিবদের বাইরে যেতে বললেন।

তাতেই বোঝা গেল ওঁর কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে। ওসমানও ওঁর তু'একজন যে বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল তাদের ইঙ্গিত করলেন ঘর খালি ক'রে দিতে। তুজনেই ঢালা ফরাসের ঠিক মধ্যস্থানে বসে—সেখানে নিম্নস্বরে কোন আলোচনা হ'লে বাইরে কারও কানে যাবার সম্ভাবনা নেই। ঘরের দরজা উন্মুক্তই রইল—গুপ্তহত্যার ভয় তো তখন এ সমাজে ব্যাপক ও প্রবল—সুতরাং আড়ি-পাতার সুযোগও নেই।

বায়াজিদ আরও একটু ওসমানের কাছ ঘেঁষে এসে বললেন, 'ভাই সাহেব, একটা কথা বলব, আপনি গুস্সা করবেন না তো?'

ওসমান বুঝলেন এতদিনের আশঙ্কিত আসল বক্তব্যটা এবার আসছে। তিনি ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'গুস্সা করার মতো কি কথাটা?'

'কিছু না, কিছু না। আমার একটা সামান্য কৌতুহল। ব্যক্তিগত—ইয়ে, ছেলেমানুষিও বলতে পারেন। তাতে কতটা কি গুস্তাকি প্রকাশ পাবে ঠিক বুঝতে পারছি না বলেই—'

এই পর্যন্ত বলেই থেমে যান বায়াজিদ।

ঠিক যেন সেইখান থেকেই খেই ধরে নিয়ে বলেন ওসমান, 'সেটা আমিও যে

ঠিক বুঝতে পারছি না, একেবারে আপনাকে জবাব দিই কি ক'রে? তবে আপনিও যদি আমাকে সরল উত্তর দেবার অধিকার দেন তাহলে বলি কি, আপনি বলেই ফেলুন। খুব একটা স্বার্থহানি বা সম্মানহানির ভয় না থাকলে গুস্সা করবই বা কেন?'

একটু মৌন থেকে ঈষৎ অপ্রতিভের হাসি হেসে বায়াজিদ বলেন, 'আপনি যে আহত হয়ে কিছুকাল এক জংলী গাঁয়ে পড়ে ছিলেন সে সম্বন্ধে হাজারো কিস্‌সা আমার কানে পৌঁচেছে। এক একজন এক একরকম ক'রে বলেছে। শুনলাম কি একটি এখানকার কাফেরদের পাহাড়ী মেয়ে আপনাকে ওষুধ লাগিয়ে এবং সেবা ক'রে সুস্থ ক'রে তুলেছে—ওদের পাহাড়ী জঙ্গলের গাছগাছড়ার ওষুধ—সে একা, আর কেউ সাহায্য করতে আসে নি, সব রকম সেবাই করেছে। তার সেবা, তাদের খানাতেই আপনি বল পেয়েছেন এ কি সত্যি?'

'হ্যাঁ জনাব, পুরো সত্যি।'

আর যাই হোক ঠিক এ প্রসঙ্গ আশা করেন নি ওসমান। বক্তব্যটা কোন্ দিক ঘেঁষে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে আরও যেন ধাঁধায় পড়েন।

'তাজ্জব!' বায়াজিদ বারকতক বাহবা সূচক ঘাড় নাড়েন আপন মনেই। তারপর গলাটা অকারণেই আরও নামিয়ে বলেন, 'আরও শুনলাম সে মেয়েটি জংলী মেয়ে হলেও বড় খুবসুরৎ, আর অল্পবয়সী। সে নিজে থেকে স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে চলে এসেছে। আপনি নাকি এখন তাকে নিয়েই শুধু আছেন। তার ঘরেই থাকেন। তার তৈরী খানা খান—এও সত্যি?'

'হ্যাঁ, এও মিথ্যা নয়!' সহজ ভাবেই বলেন ওসমান।

'এরা বলে, এখানের লোকের ধারণা, এখানের মেয়েরা কি সব জানে, এরা বলে 'গুণতুক'। তাই করল নাকি মেয়েটা?'

ওসমান হাসলেন এবার। বললেন, 'তার লাভ? সে তো যা কিছু আত্মীয় স্বজন ঘরবাড়ি সব ছেড়ে চলে এল। আমি নিকাহ্ করতে চেয়েছিলুম, সে বাঁদী হয়েই আছে। আমার থেকে সে বয়সে অনেক ছোট, আমার প্রথম বাচ্চার থেকেও ঢের ছোট। আমার আজ কোথাও কিছু নেই—বলতে গেলে পথের ভিখিরী। মাথার ওপর তলোয়ার ঝুলছে, অতবড় মুঘল শক্তি আমাকে দমন করতে বদ্ধপরিকর। আমার জন্যে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে এত কাণ্ড ক'রে বশ করতে চাইবে বা কেন!'

তারপর বললেন, 'তা নয় জনাবালি! এদের সেবা, এমনভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া সেবা আমাদের মুলুকের মেয়েরা ভাবতেও পারবে না। তাতেই পুরুষ বশ

হয়। অন্য কোন জড়িবুটি গুণতুক লাগেও না।'

তবুও দ্বিধা, তবুও সেই ঘাড়নাড়া আর বারকতক 'তাজ্জব' 'তাজ্জব' উচ্চারণ।

তারপর একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেই ফেললেন, অন্তরের অভিপ্রায়—'আচ্ছা, আমি এই আশ্চর্য মেয়েটিকে একবার দেখতে চাইলে কি খুব বেয়াদপি হবে?'

মুখচোখ লাল হয়ে উঠল ওসমানের নিমেষে। হাতটা বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই কোমরবন্ধের দিকে একটু এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রচণ্ড উদগত ক্রোধ দমন করলেন। মনে পড়ে গেল তিনি প্রার্থী, অধমর্ণ। এই ব্যক্তি উত্তমর্ণ হতে যাচ্ছে। এর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে কোন হঠকারিতা করতে গেলে এর কোন ক্ষতি হবে না, তাঁর কিন্তু সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না।

তাই প্রাণপণে চিত্ত দমন ক'রে শান্ত কণ্ঠেই বলার চেষ্টা করলেন, 'আমাদের ঘরে তো এই রীতি নেই আপনি জানেনই—এ প্রস্তাবকেই আমরা অপমানের সামিল মনে করি। তাই না?'

'কিন্তু জনাব', বায়াজিদের কণ্ঠ কি একটু শাণিত মনে হয়? 'এ মেয়ে আপনার হারেম বা জেনানা মহলের নয়। আপনার নিকাহ্ করা বেগম তো নয়ই। আসলে বাঁদী মাত্র। তা ছাড়া শুনেছি এদের কোন পর্দাই নেই। আপনার লোকজন যখন গিছল সে সোজাসুজি তাদের সামনে বেরিয়েছে। মাথায় মুখে একটা ওড়নাও দেয় নি। সকলের সামনে দিয়ে সে খোলামুখে এসে নেমেছে ঘোড়া থেকে। ওর ঘর যখন নির্দিষ্ট হয় নি, তখন সহজ ভাবেই সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কি আপনার সাধারণ নৌকর বা বান্দাদের চেয়েও তুচ্ছ ব্যক্তি যে আমি দেখলেই তার অপমান হবে?'

এ যুক্তি খণ্ডন করা শক্ত।

বায়াজিদ আরও বললেন, 'আমি আরও শুনেছি, সে মেয়ে বেশ বুঝদার। সে কোন দামী পোশাক বা ভাল শাড়ীও পরে না। কোন গহনা গায়ে চড়ায় নি। অতি সাধারণ ভাবে বাঁদীর মতোই থাকে। নিজে হাতে রান্না ক'রে আপনাকে খাওয়ায়। সে তো আপনার নিজস্ব জেনানার পদবী দাবীও করে নি।'

সকল রকম সন্ধান নিয়েই এসেছেন বায়াজিদ, প্রস্তুত হয়েই।

কে এমনভাবে সমস্ত কথা ওখানে শুনিয়ে* এসেছে—মনে মনে চিন্তা করেন ওসমান, এমন বেইমান! এইভাবে কি তাঁর সকল কথাই প্রচারিত হয় নাকি?

এ লোক বিদায় হলে তিনি এ বিষয়ে বোঝাপড়া করবেন। জানা গেলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেও বিলম্ব ঘটবে না প্রকাশ্যে সকলের সামনে। অল্প অল্প ক'রে

পুড়িয়ে মারবেন—যাতে ভবিষ্যতে তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের কথা লোকে এমনভাবে প্রকাশ করার আগে কিছুক্ষণ অন্তত ইতস্তত করে।

তবে সে পরে, এ লোকটি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে, উত্তরের আশা করছে। হ্যাঁ কি না—যা হোক একটা উত্তর দিতে হবে এখনই। আর 'না' উত্তরের অর্থ নিজের শেষ আশ্রয় নষ্ট করা।

প্রায় উদগত দুঃসহ ক্রোধ আর অমর্যাদাবোধ দমন ক'রে তাই বলতে হ'ল, 'আপনাকে কিন্তু তাহলে ঐ ঘরে যেতে হবে আমার সঙ্গে একা—পণ্য বস্তুর মতো কি নখাস্‌এর বাঁদীর মতো সামনে এসে দাঁড়াতে রাজী হবে না সে।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমিই বা সে প্রস্তাব করব কেন? বিশেষ সে আপনার প্রাণদাত্রী পিয়ারী। আর আপনি যেখানে বসবাস করতে পারেন সেখানে যেতে আমার অসুবিধাই বা কি? চলুন, আমি তৈয়ার।'

তবু এত্তেলা পাঠিয়েছিলেন ওসমান। কিন্তু কোন অতিথির জন্যেই বিশেষ সজ্জার কথা এখনও মাথায় যায় না আপুচির। এখানে এসে বল্‌কলের বদলে সাধারণ শাড়ি পরছে—জামার কোন বালাই নেই—সেই শাড়ি পরেই অপেক্ষা করছিল। বায়াজিদকে নিয়ে ওসমান ঘরে এসে ঢুকতে খুব যেন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই সে ওসমানের পাশে এসে দাঁড়াল, প্রায় তাঁর কোলের কাছে।

লোক-লজ্জা, সহবৎ এখনও তার মাথাতে যায় না। ওসমান চেষ্টা করেন কিছু কিছু শেখাতে—সে খানিকটা শোনে, তার পরেই হয়ত হেসে ওসমানের বুকের ওপর পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে—শিক্ষা আর হয়ে ওঠে না।

আজও তেমনি অনবগুণ্ঠিতা, নিরাভরণা, অসজ্জিতা, বুনো মেয়েটা নিঃসঙ্কোচেই একেবারে ওসমানের গায়ের ওপর এসে দাঁড়িয়ে সোজা চেয়ে রইল বায়াজিদের দিকে। শুধু একবার অস্ফুট কণ্ঠে নিজের গ্রাম্য ভাষায় বলে নিল, 'লোকটা ভাল না।'

ওসমান একটু হেসে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন। ইচ্ছেটা জড়িয়ে ধরার—বায়াজিদের সামনে অতটা পারলেন না।

বায়াজিদ কিন্তু চেয়েই আছেন।

কৃত্রিম সাজসজ্জায় আবৃতা মেয়েদের—ভয় বা লোভে কৃত্রিম হাসি কৃত্রিম প্রেম এই দেখেই অভ্যস্ত। এমন প্রকৃতির সহজ হাওয়ায় বেড়ে ওঠা সত্যকার ফুল এর আগে দেখেন নি কখনও। কচি মেয়ে তাঁদের ঘরেও আসে—কিন্তু তারাও যেন চারিদিকে একটা অন্তরাল জড়িয়ে আসে, নানা সহবতের শিক্ষায় পাথর-চাপা-পড়া ঘাসের মতো বিবর্ণ হয়ে আসে।

এমন সহজ সরল ; এমন অকুণ্ঠিতা ; এমন পেলব অথচ এমন সুন্দর—এর আগে দেখেন নি আর।

আরও কতক্ষণ চেয়ে থাকতেন তা কে জানে। ওসমান সামান্য একটু কাশির শব্দ করতে সম্বিৎ পেয়ে নিজেকে সামলে নিলেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলল ও ?'

'আপনাকে খুব ভাল দেখতে—এই কথাই বলল।'

আর কীই বা বলবেন ?

'আদাব' জানিয়ে বায়াজিদ সেই পর্ণ কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন।

॥ ৫ ॥

বায়াজিদ কররাণীর উত্তর এল সাতদিনের মধ্যেই। খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কোন পত্র লেখেন নি তিনি। তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী সুলেমানকে দিয়ে মৌখিক বার্তা পাঠিয়েছেন।

বায়াজিদ সর্বপ্রকার সাহায্য দিতেই প্রস্তুত—অবশ্য সৈন্য দিয়ে ছাড়া, মুঘলদের শত্রুতা আশু বাড়িয়ে নিতে রাজী নন তিনি—অর্থ এবং অস্ত্র সব দেবেন—কেবল এক শর্তে—তার পরিবর্তে ওসমানের ঐ নতুন বাঁদীটিকে তিনি চান। আশা করি ওসমানের এতদিনে শখ মিটে গেছে—বায়াজিদ তো মাত্র ওঁর উচ্ছিষ্টই প্রার্থনা করছেন। সুতরাং ওসমানের কোন আপত্তি হবে না।

তরবারিতে হাত দিয়েছিলেন বৈকি। অর্ধেকটা কোষমুক্তও হয়েছিল—তার-পরই পূর্বের মতো প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ করলেন। একজন সেবককে ডেকে রাজদূতের বিশ্রাম ও আহারের সকল রকম সুবন্দোবস্ত করতে বলে, পরের দিন পর্যন্ত সময় নিয়ে তখনই মন্ত্রণাসভা ডেকে পাঠালেন।

অতি বিশস্ত ও অতি অন্তরঙ্গ কয়েকজনকে। তার মধ্যে পুত্রও একজন।

বড় ছেলে সাবালক হয়েছে, তার মতও নেওয়া প্রয়োজন।

কথাটা শুনে সে-ই প্রথম মন্তব্য ক'রে বসল। অল্পবয়স্ক, অসহিষ্ণু। ক্রোধী। বলল, 'খবর এসেছে ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্য মুঘল নৌবহরের কোন চিহ্ন রাখে নি। মুঘলদের খুব সহজে এখন এদিকে ফিরতে হবে না। ও লড়াই থাক, চলুন, আমরা শ্রীহট্ট আক্রমণ ক'রে উপযুক্ত জবাব দিই।'

একজন প্রধান সর্দার দোস্ত মহম্মদ হাসলেন। বললেন, 'আমাদের এটুকু নেওয়া হয়ে গেলে স্বয়ং ইসলাম খাও শ্রীহট্ট যেতে সাহস করবেন কিনা সন্দেহ। এত পাহাড়, পথঘাট এত সঙ্কীর্ণ, ঘোড়ার খাদ্য খাবারই দুর্লভ, মানুষ তো কোন্ ছার। সেখানে লড়াই শুধু মানুষের সঙ্গে নয়, সেই সঙ্গে জমিনও এক দুশমন। তাছাড়া বায়াজিদ নিরাপদে এসে এখানে সেই যে ঘাঁটি গেড়েছে, ওকে তার পর একটাও লড়াই করতে হয় নি। ওর শক্তি বেড়েছে বই কমে নি। তোমাদের এই ভাঙা বাহিনী নিয়ে যাবে তাকে লড়াই দিতে!'

তারপর বহুক্ষণ ধরে এটা-ওটা নানা প্রস্তাব উঠল। সকলেই ক্রুদ্ধ, অপমানিত জ্ঞান করছেন। এতবড় ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে সাহস করল সে লোকটা আমাদের

নাতোয়ান দেখেই। এ অবস্থায় নিজে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত—তা নয়, সে জায়গায় এই অপমান।

এ ক্ষেত্রে মেয়েটা ব্যক্তি হিসেবে তুচ্ছ। অন্য যে কোন মেয়ে হলেও এই অপমানই লাগত। এর প্রতি কারও স্নেহ বা বিশেষ বিবেচনার কারণ নেই, একটা জংলী পাহাড়ী মেয়ে এসে সুলতানকে গুণতুক কি করেছে—অধিকাংশেরই সেই সন্দেহে বিদ্বেষের ভাব—কিন্তু তাই বলে তাঁর পিয়ায়ের খাঁদীকে চেয়ে বসবে! এ ঔদ্ধত্য সহ্য হয় না।

মোট কথা—অধিকাংশেরই মনোভাব যা প্রকাশ পেল এ সাহায্য নিয়ে কাজ নেই, আমাদের যা সাধ্য আমরা সেই ভাবেই তৈরি হই। নসিবে যা আছে তাই হবে।

ওসমানেরও তা ছাড়া কিছু বলার নেই।

তাঁর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে—একটা কোন প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তা শান্ত হবে না। কিন্তু তিনি এখন একান্ত নিরুপায়। সেই উপায়হীনতাটাই আরও কষ্টকর বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে নিজেকেই নিজে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেন। এ জান রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

সারা জীবন মার খেয়ে এসেও মাথা উঁচু ক'রে ছিলেন—খোদা এ কি চরম মার দিলেন এই বয়সে, এই অপমান হজম করতে বাধ্য ক'রে।

শেষ অবধি দোস্ত মহম্মদই বললেন, 'এত তাড়াই বা কি। আজকের রাতটা যাক না। সকলেই ভাবুন কি ভাবে জবাব দিলে কতটা কি সংঘর্ষ এড়ানো যায়। কাল ভোরে আমরা আবার মিলিত হই, তখন চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারবে।'

অগ্নিশর্মার মতোই লোহিতাভ মুখে আপুচির 'মহলে' এলেন ওসমান।

তাঁর আহারে এখন বিন্দুমাত্র রুচি নেই কিন্তু জানেন আপুচি না খেয়ে বসে থাকবে—সারা দিন-রাতও যদি তিনি না আসেন সে উপবাসী থাকবে। সেই জন্যেই আসা।

'কি হয়েছে গো, তোমার এমন চেহারা?'

আপুচি প্রশ্ন করতে করতেই হাত ধরে নিয়ে এসে চৌকিতে বসিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে গলা আর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল।

এত উষ্মা ও দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও ওসমানের মুখভাব কোমল হয়ে এল।

এ-ই জাদু। মূর্খরা জানে না, অন্য জাদুর প্রয়োজন হয় না। তাঁর জীবনে তো এমন ব্যক্তিগত সেবা পান নি কখনই—অন্য কোন ব্যক্তিও, তাঁদের মধ্যে যারা উচ্চাভিলাষী, তারা কেউই পায় না। জন্মের পর মাতৃস্তন্যই পায় না, তার অন্য যত্ন সেবা। অথচ পুরুষ বোধহয় চিরদিনই এটা চায়।

'কৈ বললে না তো, ব্যাপারটা কি? সেই বজ্জাত লোকটার কাছ থেকে লোক এসেছে, না? কি বলছে সে? টাকা দেবে না?'

ঈষৎ কৌতুকের হাসিও দেখা দেয় ওসমানের মুখে।

আপুচির চিবুকটি উঁচু ক'রে তুলে ধরে নিজের মুখের দিকে ফিরিয়ে বলেন, 'সবই দিতে রাজী আছে—তার বদলে একটি জিনিস চায় শুধু, তোমাকে চায়!'

স্তব্ধ হয়ে গেল আপুচি কিছুক্ষণের জন্যে—যদিও হাতের পাখা বন্ধ হ'ল না। তার পর আস্তে আস্তে বললে, 'আমি সেদিনই বলেছিলুম তোমাকে, লোকটা ভাল না।'

তারপর যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো হঠাৎই উঠে গিয়ে ভিজে গামছা দিয়ে ওসমানের মুখ-হাত মুছে নিল। পাশে একটা চাদর পেতে রেখে গিয়ে খাবার নিয়ে এল—তারপর প্রতিদিনের অভ্যাস মতো একটু একটু ক'রে খাইয়ে দিতে লাগল। নিজের আঁচলটা ওসমানের গলায় বুকে ঢাকা দিয়ে।

সেই আহত হবার সময় থেকে এই নিয়ম চালু রেখেছে সে। শিশুর মতো ওকে খাইয়ে দেবে—একটু একটু ক'রে। এটা যেন ওর একটা বিশেষ অধিকার।

এতে যে ওর কি অসীম আনন্দ তা লক্ষ্য ক'রেই ওসমান বাধা দেন না, নিষেধ করেন না। শিশু কন্যা জননীর রূপ ধারণ করলে বয়স্ক পিতা যেমন গৃহিণীত্ব মেনে নেয়—তেমনই নিয়েছেন ওসমান।

আহারে রুচি ছিল না আদৌ। দেহের রক্ত এমনভাবে টগবগ ক'রে ফুটলে কোন্ মানুষই বা খেতে পারে! শুধু আপুচির জন্যেই কিছুটা খেতে হয়।

ওঁকে খাওয়ানো শেষ হলে সেও খায় কিছু। চিরকালই স্বল্পাহারী—আজও সেই পরিমাণই আহার করল। কমও না, বেশীও না। অথচ ওসমানকেও জিজ্ঞাসা করল না— কেন এত কম খাচ্ছ। এইটেই সবচেয়ে ভাল লাগে ওসমানের। যত্ন আন্তরিক বলেই তার আতিশয্য নেই। সহজ ভাবে বাস্তব অবস্থা মেনে নিতে পারে। মানসিক এ অবস্থায় বেশী খাওয়া সম্ভব নয় জানে সে। সেই জন্যেই পীড়াপীড়ি করল না।

মানুষটা এ অবস্থায় তুচ্ছ। অন্য কোন আরও অবজ্ঞাত অন্তঃপুরিকাকে চাইলেও

এরা এমনি অপমানিত বোধ করত।

খাওয়া শেষ হলে এক খিলি পান এনে মুখে পুরে দিয়ে পাশে এসে বসল।

একটা হাত ওসমানের বুকে রেখে বলল, 'তার পর ? তোমরা কি স্থির করলে ? কি জবাব দেবে ?'

ওসমান বললেন, 'এখনও কি ভাবে জবাব দেব তা ঠিক হয় নি, আমি ভাবছিলুম একখানা সাদা খত পাঠাবো। যা কিছু লিখতে যাবো—অন্তরের জ্বালা প্রকাশ পাবে। রূঢ় কথা প্রকাশ পাবে। কী দরকার আর শত্রুতা বাড়িয়ে।'

আপুচি ধীরভাবে বলল, 'ন্তাখো, এটা করো না। তোমাদের যা অবস্থা তোমার মুখে শুনি, এখন ইসলাম খাঁ এলে তোমাদের যুদ্ধ করা হবে না—কোথাও পালাতে হবে—বনে-জঙ্গলে। সে আরও দুঃখ নয় কি ? তোমার ওপর এতগুলো লোক নির্ভর করছে, এতগুলো লোকের আশা ভরসা জীবন—তুমি চলে গেলে হিন্দুস্তান থেকেই পাঠানের চিহ্ন মুছে যাবে। এসবই তোমার কাছ থেকে শোনা—হিন্দুস্তান কী কতটা, তাতে তোমাদেরই বা কি অধিকার, ওদেরই বা কি—কিছুই জানি না—তবু যা শুনেছি তাই বলছি।'

ওসমান সোজা হয়ে বসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি কি বলছ ? কি বলতে চাইছ কি—তাই শুনি !'

'মাথা গরম করো না। আমি স্রোতের কুটোর মতো তোমার কাছে এসেছি—এই তো কটা দিন। তোমার ভবিষ্যৎ, মান-সম্ভ্রম, তোমার রাজ্য চিরকালের। তোমার মুখেই শুনি বারো বছর বয়স থেকে তোমাকে যুদ্ধে যেতে হয়েছে। কত জায়গায় গিয়েছ, আবার সেখান থেকে উৎখাত করেছে তোমাদের। এখন বয়স হচ্ছে, এখন কি আর পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারো। আর তুমি বেড়ালেই বা তোমার লোকজন কি আশায় ঘুরে বেড়াবে, কেন বেড়াবেঁ ? যে যার নিজের দিন কিনে নেবার জন্যে ব্যস্ত হবে। তখন তুমি একা পড়বে—কতকগুলো মেয়েছেলে নিয়ে ! তার চেয়ে আমিই একা যদি ভেসে আর এক চরে গিয়ে আটকাই, ক্ষতি কি ?'

ওসমান আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন। আপুচি দু'হাতে জোর ক'রে গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'আমার কথা কটা শোনই না। এমনিই তো আমার নামে যা-তা বলে বেড়ায় এরা, তা কি আর আমার কানে আসে না ? কেউ কেউ তো আমাকে শুনিয়েই বলে যায়। তোমাকে যদি এমন ভাবে সব খুইয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়—সব দোষটাই আমার ওপর পড়বে। কোন একদিন তোমারও মনে

হবে আমার জন্যেই তোমার রাজ্য, ভবিষ্যৎ, জীবন সব নষ্ট হয়ে গেল। তার চেয়ে আমাকেও পাঠিয়ে দাও। সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাক। আর কারও কিছু বলবারও থাকে না।'

'তুমি তাহলে পয়সাওলা লোকের কাছেই যেতে চাও! যে তোমাকে বেশী সুখে রাখবে!'

প্রায় ভগ্নকণ্ঠে বলে ওসমান।

হাসল আপুচি। বলল, 'নিশ্চয়ই। এই ক'টা মাস তোমার কাছে এসে শিখলুম যে বিস্তর। সোনা-রূপোর দাম জানলুম। ওগো মশাই, আমি তো বলতে গেলে জোর ক'রে তোমার সঙ্গে এসেছিলুম!'

তার একবারে নিজের গাল ওসমানের গালে চেপে ধরে ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বলে, 'তোমার যা দরকার ওর কাছ থেকে বুঝে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দাও। আমি বলছি, লক্ষ লক্ষ বায়াজিদের সাধ্য নেই আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রেখে দেয়—তোমার কাছ থেকে দূরে রাখে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—আমি ফিরে আসবই তোমার কাছে। এটুকু আমাকে আজও চিনতে পারো নি?'

'কিন্তু আমি যে বড় অসহায় হয়ে পড়ব পিয়ারী!'

'আমি তোমার জন্যেই সেখানে পড়ে আছি, সেখানে বসে তোমার কথা ভাবছি—এ কথা মনে পড়লেও কি জোর পাবে না? মনে হবে না—আমি অষ্টপ্রহর তোমার কাছেই আছি, তোমার পাশে, তোমার গায়ে জড়িয়ে আছি?'

একটু অবাক হয়ে যান ওসমান খাঁ।

এ ধরনের কথা শুনতে তাঁরা অভ্যস্ত নন। এমন কারও মুখে শোনেন নি। তাঁরও একাধিক স্ত্রী আছে। উপভোগ্যা বাঁদীও কম ছিল না। তারাও ভালবাসার প্রতিযোগিতায় যে নামে নি তা নয়—কিন্তু এমন কথা তো কখনও শোনেন নি।

হঠাৎ কেন কে জানে, তাঁর দু'চোখ জলে ভরে আসে।

এ জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত—বহু পরাজয়েও কখনও তাঁর কেউ চোখে জল দেখে নি।

তিনি একরকম অসহায় কণ্ঠে বললেন, 'না, সে আমি পারব না পিয়ারী। জীবনে আসল সুখের মুখ এই প্রথম দেখলুম—এখন তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

'পারতেই হবে। আমি লড়াইয়ের জায়গায় গিয়ে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে

দুশমনকে লড়াই দিতে পারব না। এটুকু সাহায্য যদি না করতে পারি—তাহলে নিজের কাছে নিজেই মুখ দেখাতে পারব না যে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বিদায় দাও আমাকে, তোমার সবচেয়ে দরকারের সময় ঠিক ফিরে আসব তোমার কাছে—কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। আমরা বাঘের মধ্যে বাস করি। সেই বাঘিনীর স্বভাব আমার—সে পরিচয় তাদের দেব।'

হতভম্বের মতো, যন্ত্রচালিতের মতো বেরিয়ে এসে আবার মন্ত্রণা-সভা ডাকেন ওসমান খাঁ।

মন্ত্রী, সর্দার, উপদেষ্টা বন্ধুর দল, পুত্রও—শুনে বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

তারপরই অনেকের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে।

ভাবটা এই—এ আমরা পূর্বেই জানতাম।

রঙ্গিনী, প্রজাপতি, সুখের চিড়িয়া, বুলবুল—এ কথাগুলোও খুব নিম্নস্বরে উচ্চারিত হয়। যারা একটু পিছনে আছে, তাদের সে একটা বিশেষ সুবিধা।

পুত্রই একটু শ্রুতিগম্য ভাবে চুপিচুপি বলল, 'বায়াজিদের অনেক টাকা। ঢের সুখে থাকবে সেখানে। সে রাজত্বও আরও বেশ কিছুদিন থাকবে তার, ভেবেছে। আমরা তো হারতেই চলেছি। ভালই করেছে, বুদ্ধির কাজ করেছে।'

ওসমানের চক্ষু ও মুখ বারে বারেই অগ্নিবর্ণ ধারণ করে, তবু তিনি উদাসীন থাকেন। যেন কিছু শুনতে পান নি এইভাবে।

এও আপুচির শিক্ষা।

আসবার আগে বার বার বলে দিয়েছে, 'অনেকে অনেক কথা বলবে হয়ত, আমাকে টিটকিরি দেবে। তুমি কিন্তু মেজাজ খারাপ ক'রো না। অনেক কথা তো এখনই বলে, আমি কি কান দিই?'

এরপর আর সিদ্ধান্তে দেরি লাগবে কেন!

যার জন্যে তাদের উষ্মা, অপমানবোধ, আত্মত্যাগের প্রস্তুতি, সর্বনাশকে বরণ করার অভিপ্রায় সে যদি পরের জুতো মাথা পেতে নেয়, ওদের কি ক্ষতিবৃদ্ধি!

না, ক্ষতিবৃদ্ধি নেই বললে একটু ভুলই বলা হবে।

ক্ষতি তো নয়ই, বরং ভালো হ'ল। আসন্ন সর্বনাশটা বাঁচল। শেষ পর্যন্ত হয়ত ওদেরই সর্বতো সুবিধা হয়ে যাবে এতে।

মুঘল শক্তি যতই প্রবল হোক তাদের আসতে হচ্ছে বহুদূর থেকে। বহু কষ্ট ক'রে—যাকে এদেশে বলে বহু কাঠ-খড়-পুড়িয়ে তাই।

এ আক্রমণ করতে আসা যেমন ব্যয়সাধ্য, তেমনি কষ্টসাধ্য। পথ দুর্গম, জলহাওয়া

অপরিজ্ঞাত, নানা ব্যাধি এর স্থলে জলে। যার সঙ্গে মুঘলদের তুরাণী সৈন্যের কোন পরিচয় মাত্র নেই। এত খরস্রোতা নদীবহুল দেশের সঙ্গেও ওদের পরিচয় নেই। বর্ষার পূর্বেই এরা ভয়ঙ্করী, প্রমত্তা রূপ ধারণ করে। নদীর সে চেহারা দেখলে এরা সভয়ে ভগবানকে ও যে যার পীরকে স্মরণ করে। যত বড় নৌকাই থাক, সে নদীতে নামতে তারা কেউ সাহস করবে না। এদেশী লোকই ভয় পায়।

তা ছাড়াও আছে।

পিছনে প্রবল-প্রতাপ ভুঁইয়ারা আছেন। ইসা খাঁ, প্রতাপ, চাঁদ রায়, রামচন্দ্র রায়—এমন কি পুঁটিয়ার পীতাম্বর দেব—কেউই কম যান না। সামনে এলে এরা যে-কোন শর্তে তখনকার মতো তুষ্ট করেন মুঘল-দেবতাদের—কিন্তু পিছন ফিরলেই সর্বরকমে অনিষ্ট করেন। এ ঘটনা বার বারই ঘটছে। এদের বাগদী সৈন্যরা কি জলপথে কি স্থলপথে সর্বত্রই যুদ্ধ করতে নিপুণ। এদের মতো লাঠিয়াল, তীরন্দাজ, বর্শা-বল্লম-যুদ্ধে অপরাজেয় কৌশলীও যেমন নেই, তেমনি নৌবহর পরিচালনা বা অপরের নৌবহর ধ্বংস করাতেও এদের জুড়ি মিলবে না। এখানে বেশীদিন থাকলে ওরা পিছন থেকে শুধু এদের শক্তিই নষ্ট করবে না, আগ্রার সঙ্গে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবে।

ওখানের বর্তমান বাদশাও আকবর শা নন। জাহাঙ্গীর নূতন প্রেমে প্রমত্ত (বহু পুরাতনও বলা যায়। সেজন্যই হয়ত এত কড়া নেশা, পুরাতন সুরা নেশার মতো তেজস্কর)—সমস্ত রাজ-শক্তিই সেই নারীর পদতলে ধরে দিয়ে ঈষৎ করুণা লাভের জন্যে লালায়িত।

সুতরাং ইসলাম খাঁকে যদি একবার ভালরকম ভাবে পরাজিত করা যায়—অচির ভবিষ্যতে ওদিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা অল্প। কারণ সে পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছলে ঐ ভুঁইয়ারা যে মূর্তি ধারণ করবেন সে ইসলাম খাঁ বোধহয় কল্পনাও করতে পারবেন না।

অতঃপর আপাত বিষণ্ণতায় মুখ মলিন ক'রে বহু বাহ্য আস্ফালনের পর স্থির হ'ল বায়াজিদের লালসার মুখে আপুচি বেগমকে ঠেলে দিয়ে এঁরা এঁদের সর্বপ্রকার আপাত-সুবিধা আদায় ক'রে নেবেন। অর্থ ও অশ্ব, কিছু হস্তী, যা যা এরা চেয়েছেন, কিছু অস্ত্রও—এসে পৌঁছলে, এদের নিশ্চিত করায়ত্ত হলে ওঁদের প্রেরিত শিবিকায় এঁরা তুলে দেবেন বেগম-সাহেবাকে।

অতঃপর সেই কপট বিষণ্ণতার মধ্যেই উৎফুল্ল হৃদয়ে তাঁরা মন্ত্রণা-সভা ত্যাগ করলেন।

শুধু একটু নিঃসঙ্গ—অনেকক্ষণ সেইখানেই স্থির হয়ে বসে রইলেন ওসমান খাঁ।

দীর্ঘ দিনের সঙ্গী সদানায় খাঁই শুধু শেষ পর্যন্ত বসেছিলেন কিছুক্ষণ। তিনি যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললেন, 'ভালই হ'ল বোধহয় জনাব, হয়ত ঐ মেয়েটার সঙ্গে আপনার দুর্ভাগ্যই বিদায় নিল—এবার চির সৌভাগ্যের উদয় হবে। হয়ত এর মধ্যে খোদাতায়ালারই মঙ্গল হস্ত আছে।'

ওঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে উত্তর দিলেন ওসমান, 'আমার তো এর উল্‌টোটাই মনে হচ্ছে বন্ধু। বোকাই নগর দুশমনের হাতে যাওয়ার ঘটনা তো ঐ মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হবার আগেকার। তখনই তো আমি নিঃস্ব সর্বস্বান্ত—বলতে গেলে মৃত। সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত।...যে রাস্তা থেকে প্রায় একটা মড়াকে নিয়ে গিয়ে বিনা স্বার্থে কোন আশা না রেখে ভবিষ্যতের চিন্তা না ক'রে সেবা ক'রে চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে তাকে বাঁচিয়ে তুলল, তার জন্য জাতিধর্ম আত্মীয় সব ছেড়ে চলে এল তার সঙ্গে এই যে বেইমানী করলাম, এতে আমার সৌভাগ্য-সম্ভাবনাকেই চিরতরে বিদায় দিচ্ছি।'

॥ ৬ ॥

আপুচি যখন বলেছিল 'আমি তোমার কাছে আসবই, কেউ আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না', তখন এ অবস্থায় পড়তে হবে তা ভাবে নি।

সে পাহাড়ী মেয়ে, বনে-জঙ্গলে তাদের বাস। নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে তাদের কোন জ্ঞান নেই, ধনী লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লোকমুখে ভাসা ভাসা দু'একটা কথা শুনেছে মাত্র, দু'একটা প্রবাদ দু'একটা অতিশয়োক্তি কিছু তামাশা।

রাজা-রাজড়াদের জীবন, আদব-কায়দা, এসবের কোন ধারণাই নেই। হিন্দু রাজা বলতে তখন আর এদেশে কিছু নেই। বঙ্গদেশে ভুঁইয়ারা* রাজার মতোই থাকতেন কিন্তু সে বহুদূরে, তাঁদের ও দেখবে কেমন ক'রে? ওসমান স্বাধীন নৃপতির মতো থাকলেও—আপুচি যখন এসেছে তখন তাঁর দুর্গত জীবন, বিপন্ন অসহায়, একরকম নিজেরই গ্রাম্য প্রজাদের মতো বাস করছেন।

বায়াজিদ কররাণী অবশ্যই দিল্লীর বাদশা কি সুলতান এমন কি উত্তর বঙ্গের পাঠান সুলতানদের মতো অবস্থাপন্ন নন। সে দাপটও নেই, সে ঐশ্বর্যও নেই। তবু এখানে এসে পর্যন্ত অনেকটা নিরাপদে আছেন, কিছুটা নিশ্চিন্তও; এর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও করতে হয় নি। আসবার সময় বেশ কিছু অর্থও নিয়ে আসতে পেরেছেন। এঁরা এখানে বাসস্থানকে দুর্গ ক'রে ফেলেছেন কতকটা। প্রাচীর পরিখা পাথর কেটে বা পাথর গেঁথে করা, তার ওপর বড় বড় শালকাঠ দিয়ে উঁচু পাঁচিলের মতো। অন্তঃপুর মুঘল হারেমের মতো খোজা হাবসী প্রহরী দিয়ে সুরক্ষিত। বোধহয় মশা-মাছিও ঢুকতে পায় না। এঁরা এমন কি বড় জমিদার বা ভুঁইয়াদের মধ্যেও পড়েন না। নিতান্তই ভাগ্যান্বেষী সেনানায়ক। তখন এমন অনেক ছিল, সুবিধা পেলে কখনও বা ভুঁইয়া সেজে বসেন, কখনও বা যুদ্ধে পিছিয়ে যান—অন্য কোথাও ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন। সেদিক দিয়ে বরং ওসমান এক

* জমিদারী প্রথা প্রচলিত হয় ইংরেজদের আমলে পারমানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টের পর। অনেকখানি জমি যাঁরা ভোগ করেন, নিজস্ব লেঠেল,ছিপ রাখেন, নিজেরা প্রজা বসান, শাসন করেন স্বাধীনভাবে—সুলতান কি বাদশাদের কিছু কর দেবার কথা কিন্তু কিছু দেন না, যুদ্ধের সময় সাহায্য করার কথা— প্রায়ই উলটোটা করেন—এঁদের বলা হ'ত ভুঁইয়া। এঁরা রাজা নামও নিতেন। মহারাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম রায় ইত্যাদি। আসলে এরা কতকটা মধ্যযুগের ইউরোপীয় ব্যারনের মতো ছিলেন।

কালে অনেক শক্তিধর এবং বেশ বড় ভুঁইয়া ছিলেন। বড় যোদ্ধাও। বোকাইনগর পর্যন্ত মুঘলরা খুব সহজে পৌছতে কি জয় করতে পারেন নি—প্রতিপদে বাধা দিয়েছেন ওসমান।

আর সেই কারণেই আজ তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত—তিনি এইভাবে মুঘল আক্রমণের সমস্ত চোটটা সামলেছেন বলেই এই পর্বত, নদী ও নিঝ'রিণী-প্রধান ভূমিতে নিরাপদে থেকে বায়াজিদ অনেক বেশী ঐশ্বর্য সঞ্চয় ও সম্ভোগ করতে পেরেছেন।

সুতরাং তাঁর চালচলনটা কিছুটা স্বাধীন সুলতানের মতো হয়ে পড়বে সেটা স্বাভাবিক।

এত কথা জানত না আপুচি।

এখানে এসে এই সব ব্যবস্থা দেখে তার বুক শুকিয়ে গেল। বুঝল যে, সে সোনার খাঁচা মনে ক'রে বাঘের খাঁচায় এসে পড়েছে।

সেই রকমই মজবুত খাঁচা, সেই রকমই মোটা শক্ত শিক দিয়ে তৈরি।

দুর্গ বললে বাড়িয়ে বলা হয় (অবশ্য আপুচি এসবও কিছু জানত না, কাকে দুর্গ বা কিলা বলে, কাকে বলে গড়—সবই ওসমানের কাছে শিখেছে), গড় বলাই উচিত। স্থানীয় লোক এই ধরনের ছোটখাটো প্রাসাদ-দুর্গকে গড়ই বলে, তার সংলগ্ন পরিখাকে গড়খাই। পাহাড়ের ওপরকার এই পরিখাতে ওপরের কোন ঝরণার মুখ থেকে জল আসে, তা বেশী হ'লে নামিয়ে দেবারও ব্যবস্থা আছে। এতেই নিচের কোন নদী থেকে নাকি কুমীর এনে ছাড়া হয়েছে। তারা সন্তান-সন্ততি সমেত এখন অনেকগুলি দাঁড়িয়েছে। এই পরিখার ওপর কাঠের সাঁকো আছে, তা কুয়ার জলতোলা বাঁশের মতো* কৌশলে তুলে নেওয়া হয়।

এ ছাড়াও ঐ হাবসী খোজা প্রহরী। এক-একটি দৈত্যের মতো চেহারা। অন্ধকারে মিশে থাকে রাত্রে—আছে কি নেই বোঝা যায় না। তাদের হাতে বাঁকা তলোয়ার।

এদের মুখের চেহারা অতি হিংস্র, ক্রূর। অন্তত আপুচির তাই মনে হয় মেয়েদের দিকে যখন চায়, আরও ক্রূর হয়ে ওঠে।

মানুষ নিজের স্বার্থের জন্যে এদের জীবনের এক বিশিষ্ট সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তারও পর ক্রীতদাসরূপে এনে সেই সম্ভোগ-পাত্রীদের প্রহরায় নিযুক্ত করেছে—তাদের দেখলে হিংস্র ঈর্ষা বোধ করাই স্বাভাবিক।

* পশ্চিমের দিকে বলে লাঠা।

তবে এরা ছাড়াও আছে।

উজবেগীস্তান না কোথা থেকে কিছু স্ত্রী-প্রহরিণীও আনা হয়েছে, দাদার-মুখে শোনা-অশোক-বনের-চেড়িদের কথা মনে পড়ে এদের দেখলে।

এই চেড়িদের ব্যবহার আরও অসহ্য। এরা অহরহ মনে করিয়ে দেয় যে হারেমের অন্য বেগমদের সঙ্গে আপুচির আকাশপাতাল তফাৎ। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছেন, বুনো, অসভ্য ভিখিরির মেয়ে—তাকেও পাহারা দিতে হচ্ছে ওদের, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে।

একেই বলে বড়লোকের খেয়াল। কী এমন নিধি এনেছেন ঘরে সরদার ই আলা! পোড়া-কপাল। যে এ প্রাসাদের ঝাড়ু লাগাবারও যোগ্য নয়—সে হ'ল বেগম!

কেউ বা নিচু গলায় বলে, 'তোরা জানিস না, এদেশের ঐ জংলী মেয়েরা নানা রকম জাদু জানে, শুনেছি পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখে।' তার উত্তরে আবার হয়ত একজন ঝঙ্কার দেয়—'সে তো শুনেছি তোদের দেশে কি তাতারেও এমন অনেক ডাইনী আছে, তারা আবার নিজেরা কম-বয়িসী মেয়ে সেজে এসে বাদশা স্থলতানদের লোহু চুষে খায়।'

কেউ চুপি চুপি কি গোপনে বলে না এসব কথা।

আপুচিকে শুনিয়েই বলে।

আঘাতটা যথাস্থানে না পৌছলে আর সুখ কি।

সবচেয়ে যেটা অসহ্য, প্রাণান্তকর যন্ত্রণা মনে হয়—সেটা হ'ল বায়াজিদের প্রচণ্ড কামতৃষ্ণা।

পাশবিক বললে পশুর অপমান করা হয়। পৈশাচিক বললে কিছুটা ধারণা করা যায়। তাও সে প্রচলিত একটা বর্ণনা মাত্র—ব্যঞ্জনা নয়।

এতকাল—অবশ্যই বেশীকাল নয়, কতই বা বয়স আপুচির—কাম জিনিসটা, স্ত্রী পুরুষে মিলনের সুখ, ভালবাসা অস্পষ্টভাবে জানা ছিল। প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল ওসমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর।

ওসমান ওর বয়স, শিশুর মতো সারল্য, নিষ্পাপ মন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, ওঁর প্রেম জন্মেছে পরে—পূর্বে কৃতজ্ঞতা বা স্নেহই ছিল প্রধান। তাই তিনি কোমল ভঙ্গুর পুষ্পদণ্ডের মতোই ব্যবহার করেছেন আপুচিকে। সাবধানে। যেন কতকটা সন্তর্পণে। শুধু যে দেহে আঘাত লাগার আশঙ্কা তাই নয়, মনে না আঘাত লাগে অর্থাৎ ওর অন্তরে তাঁর শ্রদ্ধার আসনটি না বিনষ্ট হয়—সে সম্বন্ধেও সচেতনতা ব

সতর্কতার অবধি ছিল না।

তাই এ ধরনের রূঢ়, জান্তব, উন্মত্ত সম্ভোগ সম্বন্ধে ধারণামাত্র ছিল না।

মানুষ যৌন সম্ভোগের এত রকম উপায় কল্পনা বা চিন্তা করেছে—এই তো একটা প্রচণ্ড আঘাত।

শব্দ সম্বন্ধে আপুচির জ্ঞান অতি সীমিত। তাই সে কোন বর্ণনা খুঁজে পায় না।

ঘৃণা হয় শুধু—প্রচণ্ড আতঙ্কও বোধ করে।

ঐ পুরুষ রাক্ষসটা ওর ঘরে আসছে শুনলে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়।

দৈহিক আঘাত, যন্ত্রণা, বেদনা—ক্ষতবিক্ষত হওয়ার জ্বালাও বড় কম নয়। অত্যাচারগুলো নিত্য নব নব রূপ ধারণ করছে—নিত্য নূতন কদর্যতা, নূতন নূতন বীভৎসতা। অনেক সময় অকারণে শুধুই ওকে দৈহিক পীড়ন ক'রেও যেন এক রকমের সম্ভোগ-তৃষ্ণা মেটায় লোকটা। কখনও কখনও হাবসী খোজাদেরও ডাক পড়ে এ কাজে। নরকাসুরের নরক সহচর ওরা। তাদেরও যেন এতেই তৃপ্তি।

এক-একদিন মনে হয় এইবারে মৃত্যু হবে ওর—মুক্তি পাবে। কিন্তু ঈশ্বর এই পাহাড়ী জংলী মেয়েদের মধ্যে কি যে অফুরন্ত দুর্জয় প্রাণশক্তি দিয়েছেন তা তিনিই জানেন।

কিছুতেই মৃত্যু ঘটে না।

এক এক সময় উপবাসে এই জর্জরিত দেহটাকে শেষ করবে ভাবে—তাও পারে না।

জোর ক'রে খাওয়ায় ওরা, পীড়ন করে।

সেই পীড়নের ভার ঐসব চেড়িদের ওপর।

তারা আরও নিষ্ঠুর। ওকে যন্ত্রণা দিয়েই যেন তাদের উল্লাস।

দেহটাকে যে মালিকের প্রয়োজন, তাকে জীইয়ে রাখতে হবে বৈ কি!

এর ভেতরেও বাইরের সংবাদ এসে পৌঁচচ্ছে কিছু কিছু। তাতেই আরও এত অস্থির হয়ে উঠেছে আপুচি।

সর্বশেষ বোঝাপড়া—এরা যাকে বলে আখেরি—আসন্ন হয়ে আসছে ক্রমশ।

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে দু পক্ষেই। ইসলাম খাঁ ওদিকের ব্যবস্থা সেরে ভুঁইয়াদের বিষদাঁত একেবারে ভেঙে দিয়ে আসছেন বলেই যা সামান্য বিলম্ব হচ্ছে নইলে এতদিনে এসে পড়তেন।

ওদের অত পরোয়াও করেন না যতটা চিন্তা করেন তিনি ওসমান খাঁর জন্যে।

ওসমান খাঁ যথার্থ বীর। কুশলী দক্ষ সেনানায়ক। তাঁকে বেশী সময় দিলে তিনি দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবেন। পাঠানশক্তি পুনশ্চ মাথা তুলবে। সে সময় দিলে চলবে না—মানে ততটা সময়। তবু একবার পিছনে কতকগুলো বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী লোক রেখে এসে যে ভুল করেছেন সে ভুল আর করবেন না।

তবে বিলম্ব যে আর নেই—বেশী বিলম্ব হবে না—তা ওসমান বোঝেন।

বোঝে আপুচিও।

এই গত কিছুকাল খাঁচায় বন্ধ হবার আগে ওসমানই তাকে বুঝিয়েছেন যুদ্ধের এই দাবাখেলার চালগুলো।

ইসলাম খাঁ অগ্রসর হচ্ছেন, ওসমানও প্রস্তুত হচ্ছেন।

যুদ্ধস্থানটাও মোটামুটি চিহ্নিত হয়ে গেছে।

বায়াজিদকে কথা দিয়েছেন ওসমান তাঁর রাজ্যসীমার মধ্যে যুদ্ধ হবে না। বায়াজিদকে এখনই মুঘলদের সম্মুখীন না হ'তে হয়।

ওসমানেরও সে ইচ্ছা নেই। কিছুটা তিনিও পিছনে ফাঁক রাখতে চান। নিজস্ব জমিন, যাতে বিপদ বুঝলে বিশ্বস্ত সেবকরা জেনানা মহল এবং প্রায় নিঃশেষ কোষাগার নিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবার অবসর পায়।

যদি বেঁচে থাকেন তো ওসমান খাঁও সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন সেই সর্বনাশের মুখে।

সুতরাং উনি কিছু আগুবেড়ে এসেই যুদ্ধ দেবেন।

দৌলম্বপুরে অনেকটা মুক্ত প্রান্তর আছে। সেখানে আত্মগোপন ক'রে থেকে মাঝে মাঝে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে।

এসব কৌশল ছাড়া গতিও নেই এবার।

শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশী পাঠান বাহিনীর থেকে।

আরও কিছু সংবাদ পায় আপুচি।

সেই জন্যেই এত অস্থিরতা তার—এত আকুলতা।

সংবাদ দেন বায়াজিদই।

হাসতে হাসতে সংবাদ দেন। নিজের বুদ্ধি ও সৌভাগ্য তারিফ করতে চান এই মেয়েটাকে যন্ত্রণা দিয়ে।

এটা তিনি এতদিনে বুঝেছেন বিস্তর অর্থের বিনিময়ে তিনি এই মেয়েটার দেহই কিনতে পেরেছেন শুধু।

মন ওর ওসমান খাঁর কাছেই পড়ে আছে।

অথচ শুনেছিলেন মেয়েটা নাকি স্বেচ্ছায় এসেছে তাঁর কাছে।

সে প্রশ্নও করেছিলেন একদিন। জবাবও পেয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ।

স্পষ্ট ও সত্য উত্তর।

আপুচি বলেছিল, 'তা নইলে আপনি ঐ টাকা ওসমান খাঁকে দিতেন না। অথচ তারও টাকা বড় দরকার। তার যে জীবন-মরণের প্রশ্ন।'

'তুমি কি নিজে থেকে কোনদিনই আমাকে ভালবাসতে পারবে না?'

'না। আমরা পাহাড়ী জংলী মেয়েরা—একবারই ভালবাসি, একজনকেই। তাছাড়া—আপনাদের দু'জনে আকাশ পাতাল তফাৎ।'

কেন তফাৎ, কী তফাৎ—তা সহস্র প্রশ্ন ক'রেও জানা যায় নি। কিছুতেই মুখ খোলে নি আপুচি।

কারণ মুখ খুলতে গেলে যে উত্তর দিত হ'ত তা বড় রূঢ়। বলতে হ'ত—'সে মানুষ, মরদের বাচ্চা। তুমি মানুষ নও, দানব। সে চায় ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে। সে চায় নারীদেহকে ফুলের মতো সযত্নে উপভোগ করতে—তুমি চাও রাক্ষসের মতো গিলতে।'

হয়ত এ উত্তর অনুমান করতে পেরেছিলেন বায়াজিদ—তাই নির্যাতন ও প্রহরার কঠোরতা বেড়ে গিয়েছিল।

দৈহিক নির্যাতন তো তবু মাত্র সম্ভোগকালে—মানসিক নির্যাতনই সমধিক, প্রায় অহোরাত্র।

আয়োজন দ্রুত চলছে নিখুঁত ভাবেই প্রায়।

পরিশ্রমেরও অন্ত নেই।

শুধু অনুচররা যেন সে আগের নেতাকে আর খুঁজে পাচ্ছে না।

কেমন যেন প্রাণহীন, অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছেন।

দেহটাই কাজ করে যাচ্ছে। বহুদিনের অভ্যাসে। তার পিছনে মন নেই। যেটুকু বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন আয়োজনে সেও অভ্যাসেরই ফল।

সর্বদাই বিষণ্ণ থাকেন। বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক।

মধ্যে মধ্যে যেন কি চিন্তা ক'রে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করেন—যেন কি কঠোর প্রতিজ্ঞায়—আবার হতাশভাবে সে মুষ্টি শিথিল ক'রে এলিয়ে পড়েন।

এই সুসংবাদটি দিয়ে বায়াজিদ এক ধরনের ক্রূর হাসির সঙ্গে বলেন, 'এ আমি জানতাম। তুমি চলে এলে তার খোলশটাই পড়ে থাকবে, ভেতরের সাপটা যাবে মরে। সেই জন্যেই ঐ শর্ত করিয়ে নিয়েছি, যুদ্ধ করতে হবে আমার রাজত্বর বাইরে। ঐ হারামীর বাচ্ছা ইসলাম খাঁ যেন আমাকে না এর ভেতর জড়াতে পারে।...এ লড়াই ওসমান খাঁ ফতেহ করতে পারবে না!'

এই সব সংবাদ শোনে আর নিষ্ফল ক্রোধে সুগভীর হতাশায় কপাল চাপড়ায় আপুচি।

এমন জানলে—সে ওসমান খাঁর বুকের এতটা স্থান অধিকার করেছে জানলে সেও আসত না।

মরলে দুজনে একসঙ্গেই মরতে পারত তবু। এসে কী করল। উপকার করতে গিয়ে বুঝি অপকারই ক'রে বসল।

আবার এক এক সময় সব হতাশা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে ওঠে।

সাপ হয়তো মরেছে—সাপিনী মরে নি।

যাবার আগে সে পরিচয় দিয়ে যাবে।

এখানে এসে অনেক কিছুই শিখেছে আপুচি।

মানুষ যে কত স্বার্থপর হতে পারে, নিজেদের সামান্য কিছু লাভের জন্যে অপর মানুষ সম্বন্ধে কি নিষ্ঠুর হতে পারে, কী অমানুষিক অত্যাচার করতে পারে,—সে সম্বন্ধে এতকাল ধারণামাত্র ছিল না।

খোজা কাকে বলে জানত না। এই লোকগুলোকে যে বালক বয়সে এদের সুদূর কোন দেশ থেকে ছলেবলে কৌশলে ধরে এনে পুরুষত্বহীন ক'রে এখানে ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করা হয় তা তো জানতই না।

সে-সব নাকি হাজার হাজার ক্রোশ দূরের সব দেশ।

সরল অশিক্ষিত বর্বর দেশের মানুষ। এরা কারও দেশ আক্রমণ করে নি কখনও। নিবিড় জঙ্গলে হিংস্র ভয়াবহ শ্বাপদ, বিষাক্ত সাপ, আর অতিকায় কুমীরের মধ্যে বাস করে।

তাদের অপরাধ প্রকৃতির মধ্যে বাস ক'রে বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় হয়ে ওঠে—বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাই ক্রীতদাসের হাটে ওদের দাম বেশী। কিছু এমনিই বিক্রী হয়—তারা মালিকের ঘরে দৈনিক বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করে, আর কিছু এইভাবে খোজা ক'রে বিক্রী করা হয়।

পুরুষত্ব প্রকাশের উপায় না থাকায়, বীর্যক্ষয় হয় না বলে আরও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এক-একজনের দৈত্যের মতো চেহারা হয় যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে।

ধনীরা এদের কিনে এনে অন্তঃপুরের প্রহরায় নিযুক্ত করেন। পুরনারীদের অপর পুরুষ সংসর্গ-সম্ভাবনা লোপ করবে, অপরের লোভ থেকে রক্ষা করবে—নিজেরা লুব্ধ হতে পারবে না, দেহে অপরিসীম বল থাকা সত্ত্বেও সম্ভোগ করতে পারবে না।

এই কথাই জানে সকলে।

কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি আপুচি, কয়েক মাসেই বুঝল, সম্ভোগ করতে না পারুক—লুব্ধ এরাও হয়।

সে আরও জ্বালা। সেই জ্বালায় ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মতোই হিংস্র হয়ে ওঠে। অত্যাচারী নির্মম।

ক্রমশ আরও দেখল, আকারে ইঙ্গিতে বোধ হ'ল—এদেরও একপ্রকার সম্ভোগের ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়। সন্তানের জন্ম দিতে না পারুক—আংশিক ভাবে লালসা নিবারণ করতে পারে।

কোন কোন ক্রীতদাসী সাময়িক ভাবে অদৃশ্য হয়। একাধিক দিন দেখেছে এইসব খোজারাই ধরে কোনো অন্ধকার নির্জন স্থানে টেনে নিয়ে যায়।

যৌনকামনা অন্তত আংশিক চরিতার্থ করার উপায় না থাকলে অভিসারের অর্থ কি?

মন স্থির ক'রে ফেলল আপুচি।

সে এই সব দাসদের মধ্য থেকে সবচেয়ে তরুণ যেটি—অবশ্যই অপরিণত বুদ্ধি হবে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই আবেগ-প্রবণতা কমে যায়, প্রেম কৃতজ্ঞতা এসব বিলুপ্ত হয়—সেটির দিকে কটাক্ষ হানতে লাগল, অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে লাগল।

তার ফল যে ফলছে তাও বুঝতে বাকী রইল না।

দেখল দু'চার দিন পরেই ছেলেটার চাহনি তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠছে, এমন নাতিউষ্ণ আবহাওয়াতেও ওর দিকে চোখ পড়লেই তার দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠছে। নিকষ কালো পাথরের মতো দেহ থেকে জলধারার মতোই সে স্বেদ গড়িয়ে তৈলাক্ত পিচ্ছিল ক'রে দিচ্ছে। দুই পায়ে কাঁপন উঠছে।

আরও কিছুদিন পরেই সে চোখে উগ্র ক্ষুধা ফুটে উঠতে দেখল। একটা জান্তব উগ্রতা। হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য তৃষ্ণা।

অবশ্য অবসরও অল্প।

চারিদিকে অসংখ্য লোক। পাহারা দেয় জেনানা মহলের ফটকে মোট তিনজন। পালা ক'রে পাহারা দেয় তারা। তিনজন খোজা ছাড়াও তাতারিণী আছে। তারা থাকে ফটকের ভেতরে। আবার ওরই মধ্যে এই ছোট্ট নতুন মহলে আপুচি যেখানে থাকে বিশেষ পাহারা দেবার ব্যবস্থা। এ মহল আপুচি বা পাহাড়ী বেগম (প্রহরিণীরা বলে জংলী বেগম) আসবার পর নতুন ক'রে তৈরী করিয়েছেন বায়াজিদ, নতুন ক'রে সাজিয়েছেন।

এবং এই পাহাড়ী মেয়েদের অসীম সাহস, বেপরোয়া ভাবের বহু কাহিনী শুনেছেন বলেই বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা।

এমনি তো ওঁদের মুলুকের ধরনে এসব ঘরে কোন বাতায়নের ব্যবস্থা নেই, পুরু শালকাঠের নিরন্ধ্র দেওয়াল। ওপরের দিকে কিছু ফোঁকর মাত্র আছে, তাও লোহার শিক দেওয়া। যা কিছু সম্পর্ক বহির্জগতের সঙ্গে ঐ খোলা দ্বারপথেই। সেই দরজারই বাইরে আর এক দরজা। তার বাইরে আছে খোজারা, ভিতরে এই তাতারিণীরা। আপুচি বলে, রাক্ষস আর চেড়ি।

সুতরাং এর ভেতর দেখা হওয়া তো দূরের কথা—চোখে চোখ পড়ার সুযোগ নামমাত্র।

আপুচি মধ্যে মধ্যে এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়ায়—তাই কদাচ কখনও সুযোগ ঘটে।

প্রথম প্রথম চেড়ির দল হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে আসত—আপুচি রুদ্রমূর্তিতে চাইতে আস্তে আস্তে মাথা নিচু করত। তবে দোর ছাড়ে না। মানে বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে না।

তাও গোড়ায় নালিশ করেছিল চেড়িরা বায়াজিদের কাছে, বায়াজিদও শাসন করতে গিছলেন। এক কথায় ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছে সে।

বলেছে, 'জানোই তো আমি খোলা জায়গার বুনো মানুষ, বুনো পাখী কি বুনো জন্তুকে খাঁচায় পোরে লোকে, সে খাঁচা চেরা বাঁশে তৈরী, তার চারিদিক থেকে হাওয়া পায়, ফাঁক দিয়ে চারিদিকের জিনিস দেখতে পায়। তুমি পুরেছ নিরেট দেওয়ালের মধ্যে। হাওয়া নেই, বাতাস নেই—একটি দরজা—তাতে মোটা পর্দা। ঘামে সেদ্ধ হয়ে যাই, দম বন্ধ হয়ে আসে। এভাবে থাকতে আমি পারব না। বেশী বাড়াবাড়ি করো—ওদেরই তলোয়ার কেড়ে নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দেব।'

ভয় পেয়েই যেন চুপ ক'রে যান বায়াজিদ।

তিনি যতই বড় যোদ্ধা হোন, বুদ্ধিমান, ক্রূর, নিষ্ঠুর—এই মেয়ের কাছে তাঁকেও হার মানতে হয়।

যে প্রাণের পরোয়া করে না, দৈহিক যন্ত্রণাকে ভয় করে না, তাকে শাসন করবেন কি ক'রে।

সেই থেকেই ভিতরদ্বার কেন, ক্রমশ বাইরের দরজায় এসে দাঁড়ানোরও বাধা ঘুচেছে। তবে তার বেশী নয়।

তবে আপুচির কাজ যে ফতে্হ হয়ে গেছে তা সে বুঝেছিল। বুঝেছিল নিজের স্বাভাবিক জ্ঞানেই।

এই সব সুদৃঢ় দেশের বর্বর মানুষ যৌবনে ও দৈহিক শক্তিতে আপনিই অর্ধ-উন্মত্ত—এরা যদি কামনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে তাহলে এদের বাধা দেওয়া কঠিন।

এই খোজা ছেলেটাও—আব্বাস বুঝি নাম, ঠিক বুঝতে পারে না আপুচি, এ নাম এঁরাই দিয়েছেন, ওদের এ ধর্ম নয় তাও শুনেছে, এদের এসব নাম হবে কেন—কামনায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

সুতরাং এবার যা করবার, ও-ই করবে। সেই জন্যেই শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল।

সুযোগ যে খুব সহজ নয়—তাও বোঝে।

শুধু খোজা বা তাতারিনী নয়—প্রাসাদ ঘিরে কিছু সৈন্যও থাকে। পরিখার বাইরে। সশস্ত্র প্রস্তুত প্রহরী। বিশস্ত, পুরাতন।

যেন মনে হয় এই সব পাঠান সর্দার, সুলতান—কারও জীবনই নিরাপদ নয়, সর্বদাই এদের ভয়, কে কখন বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠবে।

এমন নাকি হয়ও এদের মধ্যে হামেশা। এইভাবেই একজনকে সরিয়ে আর একজন গদী নেয়। এমন কি হাবশী ক্রীতদাসও কিছুদিন এইভাবে গৌড়ের সুলতানগিরি ক'রে গেছে।

তাই বায়াজিদ যদি বেশী সতর্ক হয়ে থাকেন তো দোষ দেওয়া যায় না। ওসমান খাঁর এমন কোন গদীই নেই। নেই নিজেরই আশ্রয়ের ঠিক, তাই তিনি অনেকটা বেপরোয়া।

বায়াজিদ এইসব রক্ষীবাহিনীর প্রধানদের প্রতি দিন ও রাত্রে বদল করেন, কাকে দেবেন পূর্ব মুহূর্তেও জানান না। এমন কি নিজের ছেলেদেরও পর্যায়ক্রমে এক এক দিন এই অধিনায়কত্বের ভার দেন। সারারাত জেগে পাহারা দিতে হয় তাদের।

রক্ষীরা দেয় বায়াজিদের প্রাসাদ পাহারা, ছেলেরা রক্ষীদের পাহারা দেয়—যদিও সে কথা তাদের বলা হয় না।

এর মধ্যে দিয়ে মুক্তির পথ কেমন ক'রে বার করবে ঐ ছোকরা—তা বুঝে পায় না আপ্পুচি, শুধু তার কামোন্মত্ততার ওপর ভরসা ক'রে নীরবে প্রতীক্ষা করে।

অবশেষে সুযোগ আসে।

সংবাদ পৌছয় ইসলাম খাঁ এবার দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন হিন্দুস্তানের এই পূর্ব-উত্তর প্রান্ত লক্ষ্য ক'রে।

বায়াজিদ তাঁর সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য এবার চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

ওসমানের ঘাঁটি ওঁর রাজ্যসীমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করল কিনা—কোথায় ঠিক যুদ্ধ হচ্ছে, ওসমান পরাজিত হলে তার ছত্রভঙ্গ সেনারা পালিয়ে এসে ওঁর সীমানায় ঢুকে পড়বে কিনা—তার ফলে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার ছলে ইসলামের সৈন্যরা—এগুলো দেখা দরকার।

যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক পিছনে ওঁর যে রাজ্যসীমা—সেখানে কড়া জবরদস্ত পাহারা রাখা দরকার, যাতে ওসমানের সেনারাও না ঢুকতে পারে।

এসব কাজ অন্য কোন লোক পাঠিয়ে হয় না—এতকাল পালিয়ে বেড়িয়ে বহু স্থানে ঘা খেয়ে বায়াজিদের লোকচরিত্র সম্বন্ধে এটুকু জ্ঞান হয়েছে—নিজেই তাই কদিনের জন্যে এ কাজে রওনা হলেন।

আগে ভেবেছিলেন আপ্পুচিকেও নিয়ে যাবেন। আপুচি একটু চালে ভুল ক'রে ফেলল। ঈষৎ ব্যগ্রতা দেখিয়ে ফেলল।

বায়াজিদ কোন প্রশ্ন করার আগেই প্রশ্ন ক'রে বসল, 'তা আমাকে কি যেতে হবে সঙ্গে ?'

সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে উঠলেন বায়াজিদ।

মনে হ'ল, এ যা বেপরোয়া সাংঘাতিক মেয়ে, সীমান্ত পরিদর্শন মানে এর মাতৃভূমির কাছাকাছি গিয়ে পড়া। সেখানের মাঠ পাহাড় নদী সব এর পরিচিত—

কোন ফাঁকে পালাবে হয়ত।

তিনি মত বদলে ফেললেন নিমেষকাল মধ্যেই। বললেন, 'না। তোমার এই খাঁচায় থাকাই ভাল।'

প্রহরী আর প্রহরিণীদের ডেকেও বলে গেলেন, 'খুব সাবধানে চোখে চোখে রাখবে। এ মেয়ে সব পারে। এ যদি পালায় আমি তোমাদের জ্যান্ত ভালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো। আরও দেখো, আমার অন্য বেগমরা না বিষ দিয়ে মারে, কিম্বা খুন করায়।'

এবার আব্বাস ভরসা।

কিন্তু এই যে অধিক সতর্কতার কথা বলে গেলেন বায়াজিদ, ফলে তারা যেন শেকল বাঁধার মতো প্রবেশ পথের বাইরে বসে থাকতে লাগল। একটা ইঁদুর ঢোকারও পথ নেই, আব্বাসই কি পারবে এ বাধা ঠেলে পৌঁছতে?

অথচ এ-ই একমাত্র অবসর।

ওদিকে আর সময় নেই। ইসলাম খাঁর বাহিনী খুব নিকটে এসে গেছে।

তার মানে যুদ্ধও।

হয়ত এই-ই শেষ যুদ্ধ ওসমানের। এসপার না হয় উসপার।

হয়ত জিতবে, না হয় পালাতে হবে। পালাতে গেলে কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক কি। সেক্ষেত্রে আর কি তার দেখা পাবে?

ক্রমশ যেন পাগল হয়ে ওঠে আপুচি।...

তবে দেখা গেল আব্বাস ওর চেয়েও পাগল হয়ে উঠেছে।

সে রক্ষী ও তাতারিণীদের বুঝিয়ে বলল, কর্তার কড়া শাসনে জীবন ওদের দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এইবেলা একটু আমোদের আয়োজন করতে দোষ কি?

বলা বাহুল্য এমন শুভ প্রচেষ্টায় কারুরই কিছুমাত্র আপত্তি থাকার কথা নয়—রইলও না।

সে আমোদের আয়োজন অবশ্য আব্বাসই করল।

উৎকৃষ্ট মাংস সংগ্রহ ক'রে অগ্নিপক্ক করে নেওয়া হ'ল, তাতে সংযোজিত হ'ল এদেশী লাল লঙ্কা-বাটা, আর এল ভর্তি দু'পিপে দেশী মদ।

সুলভও বটে, কড়া নেশার বস্তুও বটে।

অতঃপর সামান্য কিছু ধুতুরার রস সে মদে মিশোতে কতক্ষণ?।

আর কে-ই বা তা টের পাচ্ছে।

শুধু নিজে খাবার সময় কাঠের পাত্রটা মুখে তুলেছে এবং হুল্লোড়ের ফাঁকে সে মদ মাটিতে ঢেলে দিয়েছে।

এর যা ফল তা শিগগিরই ফলল। দণ্ড-তিনেক সময়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল সকলে।

সে ঘুম সহজে ভাঙবে না—সে সম্বন্ধে আব্বাস নিশ্চিন্ত।

সে এবার ভেতরে এসে আপুচির হাত ধরল।

আবেগে ঈপ্সায় (এবং বোধহয় কিছুটা এই অসম সাহসিকতার ফলাফল চিন্তা ক'রে আসন্ন বিপদের আশঙ্কাতেও) হাত কাঁপছে তার। হাপরের মতো নিঃশ্বাস পড়ছে। সমস্ত নগ্ন উর্ধ্বাঙ্গে জলের মতো ঘাম ঝরছে, তার তীব্র দুর্গন্ধ।

তা হোক। নিজের মুক্তির জন্যে সব সহ্য করতে রাজী আছে আপুচি।

কিন্তু সে নড়ল না।

বলল, 'উঁহু, অত সহজে হবে না। আমাকে বাইরে ঐ পরিখা পার ক'রে ওপারে কোন জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে, তারপর তোমার পাওনা তুমি বুঝে নিও।'

কী একটা—আপুচির কাছে দুর্বোধ্য—কটূক্তি ক'রে আরও সবলে ওকে নিজের দিকে টানতে গেল আব্বাস। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টের পেল বুকের ওপর তীক্ষ্ণ-ধার কোন অস্ত্রের স্পর্শ।

কখন বিদ্যুৎবেগে আপুচি যে এদেশের বাঁকা ছোরা বা কিরীচ* বার ক'রে বুকের ওপর ধরেছে, তা দেখতেও পায় নি সে, এতই দ্রুত হয়েছে কাজটা।

এ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতই ছিল আপুচি। ছেলেটার আর দেরি সইছে না। সইবে না। কিন্তু ওর তৃপ্তির জন্যে অবশ্যই আপুচি ওকে উত্তপ্ত বা উত্তেজিত করে নি। ওকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেবার জন্যেই এত নিচে নেমেছে সে।

ভয় পেয়ে আব্বাস পিছিয়ে গেল তিন পা।

এ আবার কি হ'ল। তবে কি ভুল বুঝেছে সে? কিন্তু সেও যে আর সামলাতে পারছে না নিজেকে।

বলল শাণিত শীতল কণ্ঠে আপুচি, 'আমাকে এই পাহারা এড়িয়ে ঐ জঙ্গলে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিছু আশা করো না। তখন তোমার পাওনা বুঝে নিও, আমি ঠকাবো না।'

* কিরীচ বা পোতুর্গীজ 'ক্রিস' বলতে বাঁকা তলোয়ারকেই বোঝায়। কিন্তু পরবর্তীকালে বাঁকা ছোরা অর্থেও ব্যবহার হয়েছে।

এত কথা হয়ত বুঝল না আব্বাস, তবে মর্মার্থটা বুঝল। কিন্তু ঐ পাহারা পার করা?

সে কেমন ক'রে হবে?

পরিখার বাইরে—যারা বা প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে তাদের কি ক'রে বশ করবে? তেমন কোন আয়োজন তো করে নি।

আপুচিই সে বুদ্ধি বাতলাল।

বলল, 'ঐ বড় গাছটার আড়ালে আমাকে যেতে দাও, ঐখানে আমি লুকিয়ে থাকি। তারপর তুমি সামনে গিয়ে চীৎকার ক'রে বলো এখানের বেইমান পাহারা-দারগুলো সব নেশা ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই ফাঁকে কে বোধ হয় পাহাড়ী বেগমকে নিয়ে সরে পড়েছে কিম্বা সেই হারামজাদীই পালিয়েছে। তোমরা শিগগির চারি-দিকে খোঁজ। পোল নামাও। সর্বনাশ হয়ে গেল—খুঁজে বার করতে না পারলে কারও রক্ষা নেই। সুলতান এসে এই বেইমানী দেখলে আমাদের সবাইকে জ্যান্ত কুকুর দিয়ে খাওয়াবে, না হয়তো পুড়িয়ে মারবে। চলো চলো আর দাঁড়িও না।'

বুদ্ধিটা মনে লাগল আব্বাসের। সেও আর অপেক্ষা করল না। সময় আর মোটে নেই, তা সে-ই এদের চেয়ে বেশী জানে।

আপুচি আগেই একখানা রঙীন কাপড় পরে ছিল, গাঢ় সবুজ রঙের। দূর থেকে তাকে দেখতে পাবার কথা নয়। তৎসত্ত্বেও আব্বাস তাকে যতটা সম্ভব আড়াল ক'রে পরিখার ধারের বড় বড় ঘাস ও আগাছার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা ঝাঁকড়া-পাতা কি গাছের আড়াল রেখে কাঠের বড় পোলটা যেখানে নামানো হয় তার সামনে এসে মহা চেঁচামেচি জুড়ে দিল।

'খুঁজে ছাখো' বলতেই বেশী কাজ হ'ল। কেউ এদিক ওদিক খুঁজতে গেল না। পোল নামিয়ে সবাই তার ওপর দিয়ে দুড় দুড় ক'রে ছুটে এসে আপুচির ঘরের মধ্যেই ঢোকার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সকলেরই অনন্ত কৌতূহল এই অতি সাধারণ জংলী পাহাড়ী বাঁদী সম্বন্ধে। কি দেখেছে এর মধ্যে এইসব সুলতানরা আর না জানি সে পিয়ারীর ঘর কেমন ক'রে সাজিয়েছে।

ইচ্ছে ক'রেই বায়াজিদের দেওয়া অলঙ্কারগুলো সামনে খুলে রেখেছিল আপুচি।

দেখতে দেখতে সেগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি ধাক্কাধাক্কি শেষ অবধি মারামারি শুরু হয়ে গেল।

এ-ই পর্যাপ্ত অবসর।

নিরাপদ সুযোগ।

ওদের লক্ষ ওদিকে, কেউ এদিকে তাকাবে না।

আব্বাস একরকম ওকে টেনে নিয়ে সেই কাঠের পুল পার করল। তারপর সোজা কাঁধে ফেলে ছুটল পশ্চিম দিকে ঘন জঙ্গলের দিকে—এই রাজধানী বা প্রাসাদ দুর্গ থেকে যত দূরে হয়।

বিস্মিত পরিতৃপ্ত আব্বাসেরও একসময় রূঢ় বাস্তব সম্বন্ধে সচেতনতা আসে।

এ অনাস্বাদিত সম্ভোগ সম্বন্ধে একটা আবছা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র ছিল এক এক জনের মুখে শোনা এক এক রকম বর্ণনা থেকে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সে ধারণার বা কল্পনার অতীত।

বিস্ময় সেই কারণেই।

এ যেন এক নূতন জগৎ যা থেকে ভাগ্য তাদের অকারণে বঞ্চিত করেছেন।

বিস্ময়ের আরও কারণ—আপুচি যে তাকে সত্যিই এ সুযোগ দেবে—এত সহজে—তাও ঠিক যেন আশা করে নি। করতে সাহস করে নি।

সবটাই, সমস্ত ঘটনাটাই তার কাছে এখনও অবিশ্বাস্য। স্বপ্নের অতীত।

আব্বাস কেমন ক'রে জানবে—সুদূর পশ্চিমে বহু সহস্র ক্রোশ দূরের এই বর্বর মানুষ—এ দেশের এই পাহাড়ী মেয়েদের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে পৃথক এক ধরনের বিশ্বাস ও ধারণা, নীতিজ্ঞান।

উপকৃতর প্রধান কর্তব্য উপকারীর ঋণ শোধ করা—যথাসাধ্য তা সে যত অরুচিকর এবং অবাঞ্ছনীয়ই হোক। আর প্রধান ধর্ম হ'ল সত্য পালন করা। প্রতিশ্রুতি রক্ষা তেমনিই এক ধরনের সত্যপালন। সে প্রতিশ্রুতি শুধু মুখে উচ্চারিত না-ও হতে পারে। আকারে ইঙ্গিতে আভাসে দেওয়া প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা কর্তব্য।

তাও হয়ত শেষ মুহূর্তে কি ক'রে বসত আপুচি কে জানে।

আব্বাসের অধীরতা তাকে সেই মুহূর্তটা বুঝতে দেয় নি। জঙ্গলের মধ্যে একটা তৃণাবৃত স্থানে গিয়ে অতর্কিতে কাঁধ থেকে আছড়ে ফেলল সে। তৃণাবৃত হলেও কঠিন পাথুরে মাটি, ক্ষণেকের জন্যে আঘাতে অবশ হয়ে পড়েছে। বাধা দেবার শক্তিও ছিল না। প্রথম কিছুক্ষণ কিছু বোঝারও না।

কে জানে, না পুরুষ না স্ত্রী এই প্রাণীগুলি সম্বন্ধে ওরও কৌতূহল যথেষ্ট উগ্র ছিল কিনা।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হতে একসময়ে অতি কষ্টে আপুচি উঠে দাঁড়াল।

আছড়ে ফেলার ফলে সর্বাঙ্গে ব্যথা। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দৈত্যের মতো ছেলেটার ওজনও কম নয়। উঠতে রীতিমতো কষ্টই হচ্ছে।

তখনও রাত্রির অন্ধকার হালকা হয়ে আসে নি। তেমনি চোখও অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে।

এদেশের আকাশ এমনিই আশ্চর্য রকমের স্বচ্ছ, পরিষ্কার, তার ওপর এটা ফাল্গুন মাস—কোথাও মেঘ কি কুয়াশার চিহ্ন নেই। অসংখ্য নক্ষত্র আকাশে। সে আলোও এদের তরুণ দৃষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত।

আপুচিকে উঠতে দেখেই আব্বাস ওর একখানা হাত চেপে ধরল। যাকে বলে বজ্রমুষ্টি—সেইরকম ভাবে।

এখন কিছুটা হিতাহিত জ্ঞান ফিরে এসেছে। মনে পড়েছে যে বায়াজিদের কাছে ফেরার পথ আর নেই। তিনি এসে খবর শোনামাত্র বরং চারিদিকে খোঁজ করতে লোক ছাড়বেন।

শুধু মানুষ নয়। শৃঙ্খলা-বদ্ধ কতকগুলি কুকুরও আছে। আছে বাঘ। তাদেরও ছাড়া হবে। ধরতে পারলে মৃত্যু তো অনিবার্য—তার আগে যে অশেষ যন্ত্রণা দেওয়া হবে—বায়াজিদের স্ব-উদ্ভাবিত উপায়ে—সেটা মনে পড়লেই শিউরে উঠতে হয়।

সুতরাং ওপারে যাওয়ার পথ আর নেই, সে খেয়া নৌকো পুড়িয়ে দিয়েছে নিজে হাতেই। এখন এ পারটা না হাতছাড়া হয়।

আপুচি সঙ্গে থাকলে, যদি বা ধরা পড়ে, তবু তখন বলতে পারবে—পলাতকাকে ধরবার জন্যেই এত দূর এসে পড়েছে, এই সবে ধরেছে তাকে।

আপুচি হয়ত এটা অনুমানই করেছিল।

বীর শান্তস্বরে বলল, 'আবার কি ?'

'আমার আর ফেরার উপায় নেই, সে তো তুমি জানই। চলো আমরা কোথাও জঙ্গলেই ঘর বাঁধি। তুমিই বা কোথায় যাবে। সর্দার ওসমান খাঁর কাছে ফিরলেও আমাদের সর্দার জানতে পারবে—ধরে এনে লোহার শেকলে বেঁধে রাখবে, কিম্বা বেড়ি পরাবে পায়ে।'

'তাহলে আমাকে নিয়ে চলো—খুব দূরে কোথাও—গভীর জঙ্গলে। নইলে ওদের নজর এড়াবে কেমন ক'রে? আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আছড়ে ফেলে যা গায়ে ব্যথা ক'রে দিয়েছ—আমি আর চলতে পারছি না।'...

খুশী হ'ল। এত সহজে আপুচি রাজী হবে তা ভাবে নি সে একবারও।

আশ্বস্তও হ'ল। বয়ে নিয়ে যাওয়া মানেই ওর হাতের মধ্যে থাকা।

সে আবার আপুচিকে কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত চলতে লাগল।

আপুচি আঙুল দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা দেখিয়ে বলল, 'ঐ দিকটায় চলো। ওখানে অনেক ঝরণা আছে। শিকারও বহুত মিলবে।'

ওটা যে দৌলৎপুরের দিক তা আব্বাস জানত না। কথাটা মাথাতেই যায় নি।

একান্ত নির্বোধ না হলে আগেই সন্দিগ্ধ হ'ত, আপুচির এত সহজে ওর সঙ্গে ঘর বাঁধার প্রস্তাবে রাজী হওয়াতেই।

অনেকটা চলার পর—সূর্য যখন দূর পাহাড়ের ওপারে বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে, রোদ এখানে না পড়লেও ওপারের গাছপালার নব-বসন্তোদ্ভূত সোনালি পাতায় পড়ে ঝিকমিক করছে—আপুচি বললে, 'একটু নামাও এবার, আমাকে একটু আড়ালে যেতে হবে।'

কেন ক্রীতদাস হিসেবে এদের মূল্য এত বেশী তা বুঝতে পারে আপুচি। ছেলেটার গায়ে যেন অসুরের শক্তি। ও যে কখনও পরিশ্রান্ত হয়ে নিজে থেকে থামবে সে সম্ভাবনা নেই।

আব্বাসও খুব সহজে রাজী হয়ে গেল।

তার মনে হ'ল বহুদূর এসে পড়েছে তারা—এত দূরে করুরাণীর লোক খুঁজতে আসবে না, এলেও পাবে না।

হ্যাঁ, প্রাকৃতিক কাজের প্রয়োজন তো আছেই। তার নিজেরও সে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সে সহজেই হাঁটু গেড়ে বসার মতো পিঠটা নীচু ক'রে আপুচিকে নামিয়ে দিল।

জায়গা দেখেই থামতে বলেছে আপুচি। মস্ত বড় প্রকাণ্ড কি একটা গাছের সঙ্গে চওড়া পাতাও'লা কি একটা মোটা লতা জড়িয়ে অনেকখানি অন্তরাল সৃষ্টি করেছে, নিচেও যথেষ্ট আগাছা। পাশে খুব ছোট্ট একটা ঝরণা—ঝির ঝির ক'রে জল বয়ে চলেছে।

আপুচি সেদিকে যেতে আব্বাসও একটু দূরে আড়ালে চলে গেল।

নিশ্চিন্ত হয়ে।

একেবারেই নিশ্চিন্ত হ'ল। আব্বাস শুধু গাছই দেখেছে, আপুচি দেখেছে একটা মাঝারি আকারের আলগা পাথর।

আব্বাস এদিকে পিছন ফিরে বসেছে—সেটা পাতার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সে অত সন্দেহ করে নি। গাছ ও লতার অন্তরাল সে জায়গাটাকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখে নি, রাখে না—এ আড়ালের একটা অন্য দিকও আছে—তা ওর মাথাতেই যায় নি।

আপুটি প্রাণপণ-বলে পাথরটা তুলে নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ল আব্বাসের দিকে।

সে পাথর সোজা গিয়ে লাগল তার মাথায়। কোন শব্দও বেরোল না তার গলা দিয়ে, সেইখানেই উপুড় হয়ে পড়ল।

সে যে আর উঠবে না কোন দিনই—তা আপুটি জানে। সে দ্রুত এদিকের গাছপালা সরিয়ে সরিয়ে পথ ক'রে নিয়ে চলতে শুরু করল।

দৌলতপুরের যুদ্ধ সেদিন প্রত্যুষকাল হতে শুরু ক'রে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত চলেছিল।

আরও চলত—যদি না নেতাহীন পাঠান-বাহিনী নিজেদের অসহায় বোধ ক'রে অমন অসময়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ত।

সেদিন ওসমানের বাহিনী যে যুদ্ধ করেছিল—তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। শুধু শৌর্য-বীর্য থাকলেই যুদ্ধ জেতা যায় না? তা অনেকবারই প্রমাণিত হয়েছে। রণকৌশল, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি এগুলোও প্রয়োজন।

আর তার সঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি।

এই সবগুলোই সেদিন একত্রিত হয়েছিল পাঠান বাহিনীর মধ্যে—বিশেষ ক'রে সর্দার ওসমান খাঁর মধ্যে।

তাঁর এতদিনের বিষণ্ণতা, ঔদাসীন্য বা অন্যমনস্কতা যেন সেদিন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দীর্ঘকালের ঘুমভাঙা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হিংস্র ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন।

হয় এসপার না হয় উসপার—এ তো তিনি জানতেনই।

এ যুদ্ধে না জিততে পারলে ভারতে পাঠান শক্তির অস্তিত্ব আর থাকবে না, অন্তত প্রাধান্য তো থাকবেই না। বায়াজিদের মতো দু-একজন, হীনশর্তে সন্ধি ক'রে হয়ত টিকে থাকতে পারে, তাকে প্রাধান্য বলা চলে না কোন মতেই।

অনেকদিন অনেকবার মার খেয়েছেন দুশমনের হাতে—না, নসিবের হাতে। সে-সব আশাভঙ্গের শিক্ষা বুদ্ধিতে শান দিয়েছে, দূরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করেছে।

এবার সবগুলিই প্রয়োগ করেছেন তিনি, সে-সব শিক্ষা কাজে লাগিয়েছেন।

তাছাড়াও মরীয়া ভাবটাও ওঁর দৃঢ় ইচ্ছাকে বলশালী ক'রে তুলেছে। এই শেষ সুযোগ—সে সচেতনতা।

তবে শুধু ওসমান একা নন।

সেদিনকার যুদ্ধে ওঁর ভাইরা আত্মীয়রা অধস্তন সেনাপতিরা ওঁর পুত্ররাও যে ঐক্যবদ্ধতা, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করা শৌর্য প্রদর্শন করেছেন তার তুলনাও ইতিহাসে বিরল।

সেইজন্যই অনেক অধিক সংখ্যক সৈন্য এবং নূতন কামান থাকা সত্ত্বেও সন্ধ্যার দিকে মুঘলবাহিনী শুধু ক্লান্ত নয়, যেন হতাশ হয়েই পড়েছিল।

ঠিক সেই কারণেই, সেটা বুঝেই স্বল্প-সংখ্যক পাঠানরা হয়ে উঠেছিল পুনরুজ্জীবিত।

যখন যুদ্ধে বিজয়লাভই হয়ে ওঠে একমাত্র লক্ষ্য তখন অন্য কোন দিকে বাহিনীর অপর কারও কিছু লক্ষ্য করা বা তা নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়।

তাই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রহর দুই পরে অসংখ্য মৃতদেহ আকীর্ণ রণক্ষেত্রে যে একটি সাধারণ স্ত্রীলোক কী যেন একটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল তা কারও চোখে পড়লেও সে বার্তা মাথায় পৌছয় নি। অর্থাৎ লক্ষ্য করে নি কেউ।

এই ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে মরণপণ লড়াই চলছে, সেখানে মেয়েছেলে কি করছে—হয়ত কারও মনে এসে থাকবে। কিন্তু তখন কারুরই এসব তুচ্ছ তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই, সুযোগও নেই, একহাত জমিই তখন কতবার এপক্ষে ওপক্ষে হাত বদল হচ্ছে তার ঠিক নেই। এ পক্ষের একজন এক পা এগিয়ে গেল, পরমুহূর্তেই হয়ত ওপক্ষের একজন সেটুকু দখল করল।

মেয়েছেলেটি, বিশেষ ক'রে তরুণ অল্পবয়সী ছেলেদের শবই, ঝুঁকে পড়ে ভাল ক'রে দেখছিল।

কাকে খুঁজছে ও ?

ছোট ভাই এসেছে লড়াই করতে কিম্বা অমনি কোন স্নেহাস্পদ আত্মীয় ?

কিন্তু সব তরুণের দেহ তো লক্ষ্য করছে না।

যেসব মৃতদেহের বুকে বর্শা বিঁধেছে কিম্বা তরবারি—সে-সব দেহের দিকে একবার এক চমকের বেশী তাকাচ্ছে না।

তবে ? কাকে খুঁজছে ও ? কেন খুঁজছে ?

এর উত্তর—যদি কেউ ওকে অনুসরণ করত, ওর প্রতি লক্ষ্য রাখত—তো পেত একেবারে অপরাহ্নের দিকে।

ও যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল।

একটি প্রায়-বালক সৈনিকের মৃতদেহ।

সে সম্ভবত কোন অস্ত্রে মরে নি। মরেছে অন্য কোনরকম আঘাতে।

বোধহয় অপর পক্ষের অশ্বারোহীর সামনে পড়ায় ঘাড়ার পায়ের নিচে পড়ে গিয়ে থাকবে। একাধিক ঘোড়ার পায়ের চাপে মারা গেছে। পর পর অনেক ঘোড়া এসে পড়েছিল সম্ভবত, তার মধ্যে আর সরে যাবার কি মাথা তোলবার অবকাশ পায় নি। পিষে মারা গেছে।

তাই পোশাকে ধুলো লাগলেও রক্তের চিহ্ন বিশেষ নেই।

থাকলেও হয়ত অন্তর্বাসে আছে। সে থাক। তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এদিক ওদিক দেখে সে মৃতদেহটা টানতে টানতে সরাতে চেষ্টা করল।

খুবই বিপজ্জনক কাজ।

কারণ আগেই বলেছি—যুদ্ধকেন্দ্র এক স্থানে স্থির নেই, এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে। যখানে হাতাহাতি লড়াই, ঘোড়ায় ঘোড়ায় বা পদাতিকে পদাতিকে, এক পক্ষের চাপে আর এক পক্ষকে সাময়িকভাবে পিছু হঠতে হয়। আবার এ পক্ষের সাহায্যে কিছু লোক ছুটে আসে—তখন ও-পক্ষ পিছু হটে।

সুতরাং যে কোন সময়েই চাপা পড়ার কথা।

কিন্তু দেখা গেল মেয়েটার ভয়ডর নেই। তার তখন একমাত্র চেষ্টা ঐ দেহটাকে অপেক্ষাকৃত ফাঁকায় বা নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবার।

বয়সে তরুণ, বালক মাত্র—তবু মেয়েটা দেখতে দেখতে ঘেমে নেয়ে উঠল। তা হোক—নিজের দিকে তাকালে চলবে না।

নিয়ে গিয়েও ছিল এক পাশে, সহসাই একজনের চোখে পড়ে গেল। সে ছিটকে এদিকে এসে পড়েছিল। তার ডান হাত জখম ক'রে বর্শা কোথায় ছিটকে পড়েছে, সেও খুঁজছে একটা শবদেহ, তার বর্শা যদি পায় বাঁ হাতে যুঝবে।

সে মেয়েটাকে ভেবেছে চোর।

এই সময় অনেকেই শকুনির বৃত্তি নেয়। মৃতদেহে তাদের লক্ষ্য, তবে অন্য কারণে। তারা চুরি করতে আসে। পোশাক, অস্ত্র, আংটি, তাবিজ।

সে সৈনিকটি রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস মড়াটাকে চুরণী কোথাকার।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'আমার ভাই। আমার ছোট ভাই। সকাল থেকে একে খুঁজছি, মাটি তো দিতে হবে।'

যে প্রশ্ন করেছিল সে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'জংলী বেগম! অয় আল্লাহ!'

কিন্তু আর কিছু বলতে হ'ল না।

আপুচির সৌভাগ্যক্রমে কোথা থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে একটি তীর এসে বিঁধল লোকটার গলায়। সে সেইখানেই ঢলে পড়ল।

আপুচির আসল প্রয়োজন একটা সৈনিকের পোশাক এবং একটা অস্ত্র। যাতে যুদ্ধের মধ্যবিন্দুতে পৌঁছতেও অসুবিধা না হয়। তার মধ্যে পোশাকটাই বেশী দরকারী। পোশাক হলে এত শবের মধ্য থেকে একটা বর্শা কি তরবারি সংগ্রহ করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

সেইজন্তেই ছেলেমানুষের পোশাক দরকার, যাতে তাকে বেমানান না দেখায়। এতক্ষণ, সেই ভোর থেকে খুঁজে এই মানানসই দেহটা পেয়েছে। সে দ্রুত ছেলেটার পোশাক খুলে ফেলল, তারপর নিজের শাড়ি খুলে ওটা পরে ফেলল।

যা ভেবেছিল তাই। অন্তর্বাসে রক্ত আছে। বহির্বাসেরও ভিতরদিকে রক্ত লেগেছে কিছু কিছু। তা লাগুক, অত বাছতে গেলে চলে না। এই জোর লড়াইয়ের মধ্যে রক্ত তো লাগতে পারে, নানা কারণেই লাগে। বর্শার বীভৎস গর্ত, কি গুলি বেঁধার পর যে রক্ত লাগে—তা পরে সহজ ভাবে চলা যায় না। লোকে সন্দেহ করবে।

আর, মনটাও কেমন যেন সিরসিরিয়ে ওঠে।

পোশাক পরা হলে নিজের শাড়িখানা দিয়ে শবদেহটা ঢেকে সে এদিক ওদিক চেয়ে একটা বর্শাও তুলে নিল—তারপর নিঃশঙ্ক চিত্তে এগিয়ে গেল যেদিকে ঘোরতম যুদ্ধ সেই দিকে।

॥ ১০ ॥

অপরাহ্ণ গত হ'ল, সন্ধ্যা নামল। লড়াইয়ের বিরতি নেই, বিশ্রাম নেই।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা? সে বোধ আছে ঠিকই—কিন্তু অবসর নেই, তা মেটাবার সময় নেই।

অবশেষে রাত্রির আঁধার নামল একসময়।

এবার যেন ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে পাঠানদের জীবনপণ করা প্রচণ্ড আক্রমণ মুঘলরা সহ্য করতে পারছে না আর। পাঠানদের অস্তিত্বের লড়াই, মরীয়া লোকের চেষ্টা—মুঘলদের ভাড়াটে সৈন্য। তফাৎ একটু তো থাকবেই। তারা জিত্‌লে বড় জোর কিছু লুটের সুযোগ পাবে। সে আর কতটুকুই বা। কি আছে এদেশে? বন-জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়। পাঠানের ভাঁড়ারও তো খালি। এত লড়াইয়ের পর কি-ই বা থাকতে পারে?

আপুচি বুঝল, ওসমান যদি জেতেনও—সঙ্গে সঙ্গেই অপর এক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। মুঘলরা সে পরাজয় সহজে মেনে নেবে না। বাদশার ইজ্জতের প্রশ্ন আছে, এ পূর্বাঞ্চল দমনের প্রশ্ন আছে। সামান্য এক রিক্ত নিঃস্ব সর্দারের কাছে হারলে সঙ্গে সঙ্গে অপর ভুঁইয়ারা মাথা তুলবে, বাংলার যুদ্ধ নতুন ক'রে শুরু করতে হবে।

অর্থাৎ তাদের নিভৃত প্রেম উপভোগ চিরকালের মতো স্বপ্নই থেকে যাবে।

অবসর পাবেন না ওসমান আর কোনদিনই।

তাছাড়া—গুপ্তচর-মুখে ওর উপস্থিতির সংবাদ পৌঁছবেই একদিন। বায়াজিদই কি তার দাবি ছাড়বে?

সঙ্গে সঙ্গে গৃহবিবাদ শুরু হয়ে যাবে।

ওসমান যদি এ যুদ্ধে নিহত হন—আপুচির সকল চিন্তার অবসান ঘটবে অবশ্য।

সেও মৃত্যুবরণ ক'রে অনন্ত মিলনের পথ ক'রে নিতে পারবে।

সে মন স্থির ক'রে ফেলে।

অসংখ্য অশ্বারোহীর মধ্যে পদাতিকের এগিয়ে যাওয়া বড় কঠিন, কষ্টসাধ্য। তবু আপুচি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার পথেই চলে।

এও এক রকমের সাধনা তার।

ঋষিদের সাধনা ইষ্টকে পাবার—তার সাধনা প্রিয়কে—দয়িতকে পাবার।

এক পণ বা এক-মন বলেই—পায়ও।

সেই মশাল-জ্বালা-যুদ্ধের আলো-আঁধারির মধ্যেও ওসমানের পতাকা চোখে পড়ে।

এই পতাকা যুদ্ধের সময় ওঁর সঙ্গে থাকে।

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে সে পতাকা বহন ক'রে নিয়ে যায়, যাতে নিজ দলের লোকেরা বুঝতে পারে—তাদের নেতা জীবিত আছেন এবং তাদের মধ্যেই আছেন।

কাছে এলেও দেখা দিল না আপুচি। পিছনে থেকে যুদ্ধের একটা অভিনয় ক'রে যেতে লাগল।

তার কাছে মুঘলও নেই, পাঠানও নেই। কে জিতল কে হারল, কে শত্রু কে মিত্র তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। তার জগৎ একটিমাত্র প্রৌঢ় ব্যক্তিকে নিয়ে।

অপেক্ষা—ভীড় একটু হালকা হাওয়ার জন্যে।

এত লোকের মধ্যে কিছু করা যাবে না। বহু লোক তাদের নেতাকে ঘিরে আছে।

তবে এও সে জানত যে, সব সময়ে এমন ভাবে ঘিরে রাখতে পারবে না, একসময় ফাঁক পাবেই। তার জন্যেই প্রতীক্ষা ওর।

সে ফাঁক গেল আপুচি আর দণ্ড-দুই পরে।

মুঘলরাও অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে জীবিত ওসমানকে বন্দী করতে। না হয় তাকে বধ করতে। তাহলেই পাঠান শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে।

সে উদ্দেশ্যেই হঠাৎ হঠাৎ এক-একবার দমকা প্রচণ্ড আক্রমণ করছে ওঁকে লক্ষ্য ক'রে।

আবারও সেই রকম একটা আক্রমণ এসে পড়ল। পাঠানরাও সর্দারকে বাঁচাতে বহু চেষ্টায়, বহু লোকক্ষয় ক'রে প্রাণপণে এগিয়ে গেল সেই দিকে—সর্দার ও মুঘলদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করতে।

এই-ই সুযোগ।

আপুচি পিছন থেকে, বর্শার ধারালো দিক দিয়ে নয়, বর্শার দণ্ডটা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল ঘাড়ের একটা জায়গায়—এ শিক্ষা ওর বাল্যকালের, ওর দাদা

শিখিয়েছিল, খুন না ক'রে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায়—ওসমান সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়লেন।

এর জন্য প্রস্তুতই ছিল, নিমেষে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে ওঁকে ধরে ফেলল, তারপর একটু হেঁট হয়ে বলল, 'আসমানী, আমি রে আমি। এই পুব দিকে—জঙ্গলের পথে নিয়ে চ—'

কি বুঝল আসমানী কে জানে, সে যেন নক্ষত্রবেগে একদিকটা একটু ফাঁক দেখে সেদিকে দিয়ে বেরিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে ছুটল।

কি হ'ল ঘটনাটা, কে কাকে নিয়ে গেল, সর্দার কোথায়, মারা গেলেন না পুড়ে গেলেন জখম হয়ে—তা যে খোজ করার প্রয়োজন আছে, তাও কেউ বোঝার আগে—এই আলো-আঁধারে (আলোর চেয়ে আঁধারই বেশী, বরং এই সামান্য মশালের আলোয় অন্ধকারটা আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে) শূন্যতাটা লক্ষ্য করার আগে আশমানী বহু দূর পৌঁছে গেল।

তবু বাধা পেয়েছিল বৈকি।

একেবারে সৈন্যবাহিনীর প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছে প্রবল একটা বাধা পেয়েছিল আপুচি।

কে একজন সবলে ঘোড়ার বলগা ধরে বলে উঠল, 'এ কি কে তুমি, কাকে নিয়ে যাচ্ছ। তুমি নিশ্চয় দুশমনের লোক। দাঁড়াও, জবাব দিয়ে যাও।'

কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব অন্যরকম ক'রে—কান্না-কান্না গলায় বললে, 'না জী, আমার মরদ খুব জখম হয়েছে, তাই একটু ফাঁকায় নিয়ে যাচ্ছি।'

'তোমার মরদ? তুমি আওরৎ? ঝুট্! তুমিও মরদ। নিশ্চয় মুঘলদের লোক। নেমে এসো বলছি।'

চকিতে জামার বুকের কাছটা খুলে ফেলল আপুচি।

সেই অপ্সরা-নিন্দিত বক্ষের দিকে চেয়ে নিমেষে তরুণ যোদ্ধার মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠবে—এ তো স্বাভাবিক।

এবার অন্য আকর্ষণে ও আবেগে সে ওর হাত ধরে টানতে গেল।

কিন্তু সেই ক্ষীণ আলোতেও, অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে আপুচি ওকে চিনেছে।

ওসমানের ছেলে।

সে এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি তোমার মা হই বেটা। আমি জংলী বেগম।'

বলতে বলতেই আশমানীর পেটে পা দিয়ে একটা ইঙ্গিত করেছে—আশমানী

অকস্মাৎ পিছনের পা দিয়ে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে ছেলেটাকে ফেলে দিল। তারপর ঠিক যেন পাগলের মতো ছুটে চলে গেল গাঢ়তম অন্ধকারের দিকে—জঙ্গলের মধ্যে।

জ্ঞান হ'ল ওসমানের অনেক বেলায়।

ততক্ষণে রণক্ষেত্র থেকে বহু দূরে এনে ফেলেছে আশমানী।

তার যেন ক্লান্তি নেই। কাল সারাদিন যুদ্ধ ক'রে সারারাত চলতেও কষ্ট হয় নি।

সে যেন বুঝেছে এর ওপরই তার প্রভুর জীবন নির্ভর করছে। তাঁর জীবন রক্ষা করতে ওর যদি মৃত্যু হয় হোক।

ভোর হতে, ওর অবস্থা দেখে, সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে দেখে আপুচিই ওকে দাঁড় করিয়ে ওসমানের অচেতন দেহটাকে কোনমতে নামিয়ে নিয়েছে। তার পরে খুলে দিয়েছে আসমানীর বেশবাস।

কাছেই ঝরণা একটা ছিল, তা থেকে জল এনে ওসমানের মুখে-চোখে দিয়ে একটা বড় কি গাছের পাতা দিয়ে হাওয়া করছে তখন থেকে।

আঘাতটা গুরুতরই হয়েছিল নিশ্চয়—তাই এসব সত্ত্বেও জ্ঞান হতে এত সময় লাগল।

চোখ খুলে থানিকটা বিহ্বলভাবে তাকিয়ে যেন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন ওসমান, নজর পড়ল আনত উদ্বিগ্ন একটা মুখের দিকে—

ধড়মড় ক'রে উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেলেন আবার।

বিস্ময়, অবিশ্বাস ও আশা মেশানো কণ্ঠে শুধু যেন ফিসফিস ক'রে বললেন, 'পিয়ারী, তুমি।'

'হ্যাঁ মালিক, আমি। তোমার চিরকালের বাঁদী।'

'তুমি কোথা থেকে এলে? আমাকেই বা কোথায় পেলে? এ কোন্ জায়গা? …লড়াই? লড়াইয়ের কি হ'ল?'

'তা জানি না। বলতে পারব না। সে যা হবার তা হবে। লড়াই তুমি জিতলেই কি শান্তি পেতে? রাজ্য ভোগ করতে পারতে? কি হবে ওতে তোমার? জীবনভর কি পেলে?'

তারপর বলল, 'আমি এই নিয়ে দুবার তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি—এ দেহ এখন আমার। আর ওসব নয়। আরও গভীর কোন বনপ্রদেশে, এদের থেকে বাইরে

নিয়ে গিয়ে পাতার ঘর বানাবো। তোমাকে খাওয়াবো, তোমার পাশে বসে গান শোনাবো। শুধু শান্তি আর আনন্দ আর আরাম। আর, আবার যদি ঐ অশান্তির আগুনে ফিরে যেতে চাও, নিজে হাতে তোমাকে খুন ক'রে পুড়ে মরব—এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি, এর নড়চড় হবে না।'

আরামে আলস্যে শ্রান্তিতে চোখ বুজে আসছিল, তার মধ্যেই বললেন, 'না পিয়ারী, আমি আর কিছু ভাবব না, আর কিছুই নিজে করব না। আজ থেকে আমার সমস্ত ভার তোমাকে ছেড়ে দিলাম। যা করবার এখন থেকে তুমিই করবে।'

বিশ্ব ও বিন্দু

॥ ১ ॥

কাজটা যত সহজে সারা যাবে ভেবেছিল মীরা—ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখলে আদৌ তত সহজ নয়। প্রথমত ট্যাক্সিটাই সে পর্যন্ত গেল না—অনেক দূরে নামিয়ে দিলে। বললে, 'পথের দিকে তাকিয়ে দেখুন না—গাড়ি যাবার রাস্তা আছে?'

পথের দিকে তাকিয়ে মীরাকেও মানতে হ'ল যে তা নেই। অগত্যা সেখানেই নেমে হাঁটা-দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

কিন্তু তাই বা যাবে কী ক'রে? জনারণ্যও তো নয়—যাকে বলে জনসমুদ্র—এ তাই। যে পার্কটায় সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছে সেটার ধারে-কাছেও পৌঁছবার আর উপায় নেই। যতক্ষণ ট্রাম বাস চলেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত কী হয়েছিল কে জানে, কিন্তু এখন সেই সমস্ত চওড়া রাস্তাটা জুড়ে, ট্রাম লাইনের ওপরও, সার সার সবাই বেশ কায়েম হয়ে বসে গেছে। দাঁড়ানো-ভিড় ঠেলে তবু যাওয়া চলে—এতগুলো এমন-নিরেট-ঘেঁষাঘেঁষি-বসে থাকা লোককে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় কী ক'রে?

অসহায় ভাবে চারিদিকে চায় মীরা। যতটা সম্ভব সে এগিয়েছে, কিন্তু এখন আর এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়। এমনিতেই বহু রুষ্ট চোখ বার বার তার দিকে এসে পড়েছে, নেহাৎ মহিলা বলেই সে চোখের মালিকদের উদ্যত রসনা থেমে যাচ্ছে, নইলে—, নইলে সে রসনা থেকে যে ভাষা বেরিয়ে আসত তা অনুমান করতে পারে বৈকি!

কিন্তু এখন কি করে সে?

এত রাত্রেও এত ভিড় পাবে তা সে ভাবে নি। ইচ্ছে ক'রেই রাতদুপুরে এসেছে। শুনেছে বড় গাইয়েদের গান নাকি শেষরাতের জন্য তোলা থাকে—ভাল গান গভীর রাত না হলে নাকি জমে না। কিন্তু এখনও এত লোক থাকবে—এটা সে আশঙ্কা করে নি।

ওইই বোঝবার ভুল অবশ্য।

আর সে ভুলটা এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বুঝতে পারলে।

বড় গাইয়েদের গান হয় নি বলেই এত গভীর রাত পর্যন্ত এত ভিড়। এটা তার আগেই ভাবা উচিত ছিল। অবশ্য—সঙ্গীত-সম্মেলনে টিকিট কিনে কখনও গান শুনতে আসে নি সে, সঙ্গীত জিনিসটার ওপরই তার গভীর বিদ্বেষ দাঁড়িয়ে গেছে একটা—কিন্তু বাইরে থেকে বাসে বা ট্রামে যেতে যেতে এই ধরনের মণ্ডপের

দিকে তাকিয়ে দেখেছে বহুবার। অনিচ্ছাতেও দেখতে হয়েছে। মণ্ডপের বাইরে ঠিক এত ভিড় কখনও দেখে নি।

কিন্তু এখন উপায় কি?

এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও তো যায় না।

অথচ, বিপন্ন ভাবে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে ততক্ষণে পিছনটা আরও নিরন্ধ্র হয়ে উঠেছে। পিছু হঠবারও উপায় নেই আর। জল ঠেলে এগোলে যেমন পিছনের জল মুহূর্ত-মধ্যে আবার এক হয়ে যায়—সেই অবস্থা আর কি!

এতক্ষণ ধরে কার একটা বাঁশি চলছিল, এবার সেটা থামল। মণ্ডপের মধ্যে হাততালি উঠল। না, পায়রা ওড়ানো নয়—এ যেন হাততালির গভীর গর্জন। শুনেই আন্দাজ করতে পারা যায় ভিতরে কী পরিমাণ লোক আছে। আর তার ফলে বাইরের ভিড়ের রহস্যটাও পরিষ্কার হয়ে যায় মীরার কাছে—ভেতরে আশা-বা আয়োজনানুরূপ শুধু নয়—তার অতিরিক্ত অনেক বেশী লোক হয়েছে বলেই উদ্যোক্তাদের দাক্ষিণ্যের হাত খুলেছে। তাঁরা খুশী-মনে বাইরে লাউড-স্পীকার দিয়েছেন এতোগুলো। বাইরে দাঁড়িয়ে আব্‌ছা অস্পষ্ট ভাবে শোনবার দরকার হচ্ছে না—বেশ পরিষ্কারই শোনা যাচ্ছে এখানে বসে। শুধু চোখে দেখা যাচ্ছে না শিল্পীদের—এইটুকু যা ক্ষতি।

কিন্তু সেটুকুর বদলে লাভও তো বড় কম হচ্ছে না। অনেকগুলি টাকা বেঁচে যাচ্ছে শ্রোতাদের।

তা হোক, সে যার যাচ্ছে তার যাচ্ছে, এখন মীরা এ কী বিপদে পড়ল! এখন পালাতে পারাটাই তার কাছে সবচেয়ে কাম্য কিন্তু সে উপায়ও তো আর নেই।

অবশেষে উপায় একটা হ'ল। ওপাশে দুটি তিনটি তরুণী বসে ছিল। সম্ভবত নিজের বা পাড়া-সম্পর্কের দাদাদের সঙ্গে এসে থাকবে। তাদেরই একজন বললে, 'আপনি এখানে এসে বসে পড়ুন না। একটু কষ্ট হবে, কিন্তু দাঁড়িয়েই বা থাকবেন কতক্ষণ?'

বেঁচে গেল মীরা। সত্যিই তার বড় কষ্ট হচ্ছিল। সে কোনমতে দু'একজনকে মাড়িয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেই মেয়ে দুটির প্রায় গায়ের ওপর বসে পড়ল। সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, 'বাঁচালেন ভাই, এসে পড়ে যা আহাম্মকি করেছি, না পারছি এগোতে—না পারছি পেছোতে!...তবে আপনাদের খুব কষ্ট হচ্ছে বোধহয়—এমন ক'রে বসা—।'

'তাতে কী হয়েছে', একটি মেয়ে বলল, 'এ তো কষ্ট করতেই আসা! আপনি

ভাল হয়ে বহুন, আমাদের জন্য ভাববেন না।'

তারা আর একটু, তাদের পুরুষ-সঙ্গীদের গা-ঘেঁষে বসে মীরাকে জায়গা ক'রে দিল।

ইতিমধ্যে পিছন থেকে কে 'স্‌-স্‌-স্‌' ক'রে উঠল। রবিশঙ্কর না কে একজন বাজাতে শুরু করেছেন। কথা কওয়া চলবে না।

অগত্যা মীরাকে চুপ ক'রে বসে থাকতে হ'ল।

অত্যন্ত খারাপ লাগছিল তার।

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজের ওপর রাগ ধরছিল।

কেন মরতে আসতে গেল সে, কী দরকার ছিল! রাত বারোটা বেজে গেছে, এখন ট্যাক্সি ক'রে একা ফেরাও তো বিপজ্জনক।

কোন সঙ্গী না নিয়ে এমন ভাবে এসে সে খুব বোকামি করেছে।

এদিকে রাত জাগা তার বহুকাল অভ্যাস নেই। ঘুমে দুদিকের রগের শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন। অথচ ফেরার চেষ্টা শুধু যে বিপজ্জনক তাই নয়—এখন এই ব্যূহ থেকে বেরোনোও তো অসম্ভব।

নিজের এই হঠকারিতার জন্য নিজের গালেই চড় মারতে ইচ্ছা হচ্ছিল মীরার।

নিজের চিন্তাতে সে এমনই ডুবে ছিল যে কী শুনছে,—কিছু শুনছে কিনা আদৌ—তা ই তার খেয়াল নেই। সে স্থান-কাল ভুলে পাশের মেয়েটিকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা সেই—তাঁর গান হয়ে গেছে?'

মেয়েটি তার পাশের মেয়েকে বাঁচিয়ে পিছন দিয়ে ওপাশের ছেলেটির হাতে নিজের হাতটা রাখবার দুঃসাধ্য-সাধনে ব্যস্ত ছিল, সে ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে বলুন তো? কার কথা বলছেন?'

মীরা একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'ঐ যে চ্যাটার্জী কে আছেন—'

'ও, সহদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' উৎসুকভাবে বলে মীরা।

'না। তাঁর গান হয়ে গেলে কি আর এত ভিড় থাকত। এর আদ্ধেক লোক তো বসে আছে শুধু তাঁর গান শোনবার জন্যেই—।'

কথা ওরা খুব নিম্নস্বরেই বলছিল, তবু পিছন থেকে আবারও সেই ক্রুদ্ধ ইঙ্গিত ভেসে এল—'স্‌-স্‌-স্‌!'

অগত্যা চুপ ক'রে যেতে হ'ল। না গিয়ে মীরার অন্তত উপায় ছিল না।

আজও—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে থেকে গলার কাছে কী একটা ঠেলে উঠছে, কিছুক্ষণের জন্য বাক্যহত ক'রে দিয়েছে তাকে।

ক্লান্ত সে, সহদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্তুতি শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত।

পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে—সর্বত্র।

খবরের কাগজ—এমন কি সাপ্তাহিক মাসিক একটা কাগজও খোলবার উপায় নেই।

সব জায়গাতেই সহদেব চাটুজ্যের খবর, তাঁর নূতন নূতন জয়লাভের কাহিনী।

এমন কি ইস্কুলেও তার সহকর্মিণী, তার ছাত্রীদের মুখে ঐ এক কথা—। কোথায় কোন্ সঙ্গীত সম্মেলনে বরোদার অমুক গাইয়েকে পর্যন্ত ম্লান ক'রে দিয়েছেন সহদেব; কোথায় তাঁকে এক ঘণ্টার প্রোগ্রামে হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল তবু গান নি—স্রেফ উদ্যোক্তাদের কথাবার্তা ভাল লাগে নি বলে; বিলেত থেকে বার বার ডেকে পাঠাচ্ছে; কোন মার্কিন কোম্পানি তাঁকে নিয়ে ভারতীয় ছবি তুলবে বলে দশ হাজার ডলার অফার করেছে; কোন্ বিধবা মহিলা তাঁকে একটা বাড়ি লিখে দিয়েছেন—ইত্যাদি। মীরার আর ভাল লাগে না।

অথচ আজ সে গোপনে, কাউকে না জানিয়ে—সেই সহদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান শুনতেই এখানে এসেছে। আশ্চর্য! সে পাগল হয়ে গেল নাকি?

কী হবে সহদেবের গান শুনে? তার কি লাভ?

তার জীবন থেকে সহদেব চিরদিনের মতো মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মিছিমিছি এই কষ্ট, এই দুর্ভোগ ভুগতে আসা।

না, খুব ভুল করেছে সে। খুব ভুল করেছে।

॥ ২ ॥

ভাবতে ভাবতে একেবারে নিজের মনের গহনে বুঝি ডুবে গিয়েছিল মীরা—তাই কখন যে বাজনা থেমে একটা নাচ আরম্ভ হয়েছে, আবার সে নাচও থেমেছে একসময়—কিছুই খেয়াল করে নি।

বহুদিনের অতীতে চলে গিয়েছিল সে, কষ্টদায়ক বেদনাদায়ক স্মৃতির গরলে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল, আর সেই তীব্র বিষের ধোঁয়ায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিল।

সহসা চমক ভাঙল তার—তারও আশেপাশে, এই বাইরেও তখন হাততালির তরঙ্গ উঠল। বিশিষ্ট কোন গায়ক গাইলেন বোধহয়।

মীরাও সৌজন্য-রক্ষার জন্য হাততালি দিল।

না—কিন্তু গান তো শেষ করলেন না কেউ—গান যে ধরলেন।

ও, যিনি গাইছেন তাঁর নামটা ঘোষণা করতেই ভেতরে-বাইরে এত হাততালি! নিশ্চয়ই কেষ্টবিষ্টু কেউ গাইছেন এবার।

মীরা জোর ক'রে নিজের চিন্তা থেকে সরিয়ে এনে গানে মন দিল।

গান ভাল লাগে না মীরার।

না লাগাবার কারণও আছে।

তাই সাধ্যমত সে গান-বাজনা এড়িয়ে চলে আজকাল।

নেহাৎ পাশের বাড়ির রেডিও কি পাড়ার পূজামণ্ডপের মাইকের ওপর হাত নেই বলেই কিছু কিছু কানে আসে।

তবু, গান যে সে একেবারে বোঝে না তা নয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কিছুকাল চর্চাও করতে হয়েছিল তাকে। এখন এই বর্তমান গায়কের গান মিনিট দুই কান দিয়ে শোনবার পরই বুঝল যে, যে গাইছে সে সাধারণ কোন গায়ক নয়—ওস্তাদ দলের কেউ। অসাধারণ, অসামান্য তার শিক্ষা।

আগে যেটা ছিল সাধারণ কৌতূহল, সেইটাই দেখতে দেখতে সুগভীর শ্রদ্ধায় পরিণত হ'ল—মনোযোগ আপনা থেকেই আকর্ষণ ক'রে নিলেন ভদ্রলোক।

প্রায় একঘণ্টা ধরে চলল সে গান।

কিন্তু এই দীর্ঘকালেও ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করল না মীরা।

তার মনে হ'ল তার কান ও প্রাণ দুই-ই জুড়িয়ে গেল সুমধুর সঙ্গীতের এই অমৃতধারায়।

মনে হ'ল এ গান অনন্ত কাল ধরে চললেও ক্ষতি নেই। এ গান শোনবার পর আর কোন কর্কশ শব্দ কানে আসার আগে মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়।

ব্যথা? বেদনা? নিঃস্ব রিক্ত জীবনের দুঃসহ হাহাকার?

কিছু কি ছিল মীরার জীবনে?

থাকলেও মনে নেই আর। কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ নেই কারুর সম্বন্ধে। মন এক অপূর্ব প্রসন্নতায়, পূর্ণতায় ভরে গেল যেন। অমৃত। অমৃত। শুধুই অমৃত। মীরার চারিদিক ঘিরে, ভিতরে বাইরে ঊর্ধ্বে অধেঃ শুধুই মাধুর্য!...

অবশেষে একসময় গান থামল। আবারও চারিদিকে করতালির গর্জন উঠল।

গান শুনতে শুনতে মীরার চোখে জল এসে গিয়েছিল, সে চশমা সরিয়ে চোখ মুছে পাশের মেয়েটিকে প্রশ্ন করল, 'এ কে গাইলেন ভাই?'

'ওমা, আপনি তবে কী শুনলেন এতক্ষণ? গলা শুনেও বুঝতে পারলেন না? এই তো সহদেব চাটুজ্যে।'

এই সহদেব!

মীরার মনে হ'ল অকস্মাৎ যেন তার মাথার মধ্যে একযোগে অনেকগুলো কামানের গোলা ফাটল কিংবা একসঙ্গে কতকগুলো বাজ পড়ল। এমনি অসহ্য কষ্ট হ'তে লাগল তার।

মনে হ'ল মাথাটা এখনই ফেটে যাবে এই আঘাতে—সব স্নায়ুগুলো যেন বেদনায় ঝন্‌ঝন্‌ করতে লাগল।

সে উঠে পড়ল একেবারে।

'ও কি, এরই মধ্যে চললেন? হয়ত আরও একখানা গাইবেন উনি—।'

'আমারই দুর্ভাগ্য, শোনা হ'ল না। বড্ড কষ্ট হচ্ছে—শরীরটা খারাপই ছিল, এখন যেন আর—'

কথা শেষ করতে দাঁড়াল না সে, উত্তর শুনতেও না। সবাইকে ডিঙিয়ে মাড়িয়ে ঠেসে অন্ধের মতো বেরিয়ে চলে এল। পেছনে কে কী বললে, কত কী কটূক্তি এবং বক্রোক্তি হ'ল তা সে শুনতেও পেলে না।

ভাগ্যক্রমে সামনে একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে ছিল, তাতেই উঠে যেন বাঁচল সে। কোনমতে তাকে পাড়ার নামটা বলে দিয়ে রিক্সাতেই এলিয়ে পড়ল।

॥ ৩ ॥

নিজের ঘরে যখন পৌঁছল তখন ভোর হতে আর বিশেষ দেরি নেই, তবু বিছানাতে শুয়েই পড়ল মীরা। না, ঘুম হবে না তা সে-ও জানে—শুধু বসে থাকতে পারছে না বলে শুতে হ'ল।

ক্ষোভ? অনুশোচনা? অজ্ঞাত কোন মানুষের প্রতি ঈর্ষা?

না, কোনটাই নয়। ক্রোধ, প্রচণ্ড এবং দিক্‌দাহকারী। এ ক্রোধ ভগবানের ওপর, তার সৃষ্টিকর্তার ওপর।

কেন তার ভাগ্যকে নিয়ে এ পরিহাস করবেন তিনি?

কী অধিকারে!

কেন তাকে এইভাবে বঞ্চিত করবেন? আজকের এই গৌরব, এই স্তুতি, এই প্রতিষ্ঠাতে যার সমান অধিকার, যার এই এতগুলি ভক্তের মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কথা—কেন সে এমন চোরের মতো সবার অলক্ষ্যে বাইরে থেকে শ্রোতা মাত্র হয়ে সেখানে যাবে?

কেন? কেন?

অথচ, সেদিন কি সত্যিই সে এমন কিছু অপরাধ করেছিল স্বামীকে ত্যাগ ক'রে এসে?

সত্যিই কি তার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয় নি?

দীর্ঘকাল তো সহ্য করেছে সে, দীর্ঘ আট বছর।

ধনীর সন্তান—শুধু এই দেখেই তার বাবা বিবাহ দিয়েছিলেন ওই পাত্রের সঙ্গে। আর কিছুই দেখেন নি। মীরা নিজে তখন ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে, আর সহদেব ক্লাস এইট্ থেকেই ইস্কুলের মায়া কাটিয়ে ঘরে এসে বসেছে এবং পাড়ার যত মূর্খদের সঙ্গে জুটে তবলা ঠুকছে আর ওস্তাদদের বাড়ির দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শেখবার চেষ্টা করছে। এই তো পাত্র!

বখা—না বখা ঠিক নয়, যাকে একেবারে বাউণ্ডুলে ভবঘুরে বলে, তাই।

মীরার শ্বশুর ছিলেন নাম-করা উকিল। একবার দাঁড়ালেই পাঁচশ এক টাকা ফী পেতেন তিনি। প্রকাণ্ড বাড়িতে বাস করতেন—দুখানা গাড়ি ছিল। বড় ছেলেও বাপের সঙ্গে আদালতে বেরোচ্ছে, ছোটটি পড়ছে শিবপুরে—সম্ভ্রান্ত আব্‌হাওয়া বাড়িতে।

মেজ ছেলেটার লেখাপড়া হয় নি—হল্ল হল্ল ক'রে ঘুরে বেড়ায়; তাকে ঘরবাসী করতে হবে এই জন্যেই তার বিবাহের কথা তুলেছিলেন ছেলের মা।

ওর শ্বশুরের এত সময় ছিল না যে এ নিয়ে প্রতিবাদ করেন বা কথা-কাটাকাটি করেন।

বিয়ের কথা ওর বাবার সঙ্গে ওর শাশুড়ীই কয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'বকাটে ছেলে নয় আমার—পাড়ায় যাকে খুশি ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। একটু আপনভোলা বাউণ্ডুলে গোছের—আর ঐ এক নেশা, গান-বাজনা বলতে পাগল একেবারে। ওঁর তো শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে কোন অভাব নেই। বিয়ের চাপ পড়ুক, সংসারে মন হোক, যাহোক একটা ব্যবসা-ট্যবসা ক'রে দেবেন'খন। আর কিছু না হোক, ওর বাপ দাদা উকিল—এই বাড়িতে মুহুরীগিরি ক'রে বাইরের লোক ঘরবাড়ি-জমিজায়গা ক'রে নিলে, ওর কি আর কোন একটা উপায় হবে না?'

বাবাও সেই কথাই বুঝেছিলেন। তাই আত্মীয়স্বজন কারুর নিষেধ শোনেন নি।

মেয়েকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন অবশ্য। কিন্তু মীরা কিছু বলে নি। বাধাও দেয় নি।

বাধা দেওয়া যে সম্ভব তাও মনে হয় নি হয়ত।

এ যুগের মেয়েরা—কলেজে উঠে কেন,—ইস্কুলে থাকতেই অনেকে অনেক কাণ্ড ক'রে থাকে, রাশি রাশি প্রেমপত্র জড়ো হয় তাদের বাক্সের বা দেরাজের কোণে কোণে, বহু অশ্রুর বন্যা বয়ে যায় তাদের জীবনে—নানা রকম কেলেঙ্কারিও ক'রে বসে—এ কথা মীরা পরবর্তী জীবনে বহু শুনেছে।

তার যা কাজ—এমন কথা না শুনেও উপায় নেই। কারণ অনেক সময়ই অশ্রুমুখী ছাত্রীর মা বা নতমুখ বাবারা নিজেরাই এসে বিবৃত করেন, পরামর্শ চান ওর কাছে, অথবা সতর্ক ক'রে দিয়ে যান—নজর রাখতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু মীরার কাল ছিল আলাদা।

অবশ্য সে যুগেও যে এসব একেবারে ছিল না তা নয়—দুটো চারটে কাহিনী তখনও কানে আসত, এমন কি পরিচিতদের মধ্যেও এমন এক-আধটা কেলেঙ্কারির কথা শুনেছে সে—তবু তখন বাপ-মা'র শাসন ছিল।

বিশেষত ওদের বাড়িতে শাসন ছিল আরও কড়া। ইস্কুল কলেজ থেকে দেরি ক'রে ফেরবার উপায় ছিল না—সামান্য দেরি হ'লেও কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত।

আশপাশের বাড়ির লোকের সঙ্গেও বাবা-মা বা গুরুজনদের বিনা অনুমোদনে মেশবার অধিকার ছিল না। বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনেও নানা বাছ-বিচার ছিল।

হয়ত সেই কারণেই—হয়ত বা মীরার প্রকৃতিটাই একটু অন্য ধরনের ছিল বলে—তখনও পর্যন্ত ওর মনে কারুর কোন ছায়া পড়ে নি, পছন্দ-অপছন্দর মতো মনের কাঠামোটাও তৈরি হয় নি। ঐ বয়সে স্থায়ী ছায়া পড়ার কথাও নয় অবশ্য—কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে calf-love, তাও হয় নি কারুর সঙ্গে।

মনটি ছিল শুভ্র, কাঁচা, অকলঙ্ক।

তাই বলে জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বা কৌতূহলও বড় কম ছিল না।

বাবা-মা কাকা-কাকী প্রভৃতি বয়স্ক বিবাহিত লোকদের দাম্পত্য জীবনের যে এক-আধ টুকরো ছবি চোখে এসে পড়ত মধ্যে মধ্যে, তা এক অনাস্বাদিত অননুভূত সুমধুর রহস্যেরই ইঙ্গিত দিত সে জীবন সম্বন্ধে।

তাই সম্ভবত মনের অগোচরেই বিবাহ সম্বন্ধে আগ্রহ একটু গড়ে উঠেছিল সেই বয়সেই। অকস্মাৎ বা অপ্রত্যাশিত ভাবে বিবাহের প্রস্তাবটা এসে পড়লেও খুব খারাপ লাগে নি ওর, এমন কি বয়স কম, এরই মধ্যে কেন, কিংবা আর একটু লেখা-পড়া ক'রে নিয়ে ভবিষ্যতের যে কোন দুর্ঘটনার জন্য তৈরী থাকার অবসর চাই—এমন সব কোন অজুহাতের কথাও তোলে নি সে বিবাহটা বিলম্বিত করবার জন্যে।

বরং বাড়ির কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন।

ছেলে লেখাপড়া জানে না বলেই তাঁদের আপত্তি।

যত বড়-লোকই হোক না কেন বরের বাপ—এমন ফুলের মত মেয়ে—কলেজে পড়া শিক্ষিতা মেয়েকে অমন অশিক্ষিত ভবঘুরে ছেলের হাতে ধরে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? কত পয়সাই বা আছে ছেলের বাপের যে তার লোভে এমন কাজ করছেন মীরার বাবা?

ওর বন্ধু-বান্ধবরাও কেউ কেউ ওকে ভয় দেখিয়েছিল।

সবচেয়ে বেশী বলেছিল বেলা পালিত।

ওদের মধ্যে সে-ই বয়সে বড় ছিল—এবং একটু পাকাও। সে বলেছিল, 'তোর মতো ব্রিলিয়াণ্ট মেয়ে একটা মূর্খ স্বামী নিয়ে সুখী হতে পারবি? এখনও সময় আছে, ভাল ক'রে ভেবে ছাখ বরং। সারা জীবন তোর সামনে পড়ে—আমাদের সমাজের বিয়ে, ইচ্ছেমতো ভাঙা যায় না। পয়সার মোহে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছিস না তো?'

এই বলে সে বিবৃত করেছিল তার কোন্ এক মাসতুতো বোনের কাহিনী; তাকেও তার বাবা পয়সার লোভে এক অশিক্ষিত মূর্খ জমিদারের হাতে দিয়েছিলেন। দু'চার দিন ভালই ছিল, তার পরই তার নতুন বৌতে অরুচি ধরে গেল, সে

প্রকাশ্যেই অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে মেতে উঠল। শেষ অবধি সেই বাজারের স্ত্রীলোকগুলোকে বাড়িতে আনতে শুরু করল। তাতেও মন উঠল না তার, আরও দুটি বিবাহ ক'রে বসল পর পর ; আর বড় বৌকে দিয়ে তাদের দাসীবৃত্তি করাতে লাগল বলতে গেলে। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা ক'রে জুড়লো সে।

কিন্তু এসব শোনার পরও নিজের মনের মধ্যে কোন প্রবল আপত্তি বা অসন্তোষ বোধ করে নি সে।

বরং তখনই ওর মনে হয়েছে রমার কথা—ওরই পিসতুতো বোন রমা। উচ্চশিক্ষিত পাত্রে পড়েছিল সে। যে কোনও মেয়ের পক্ষে দুর্লভ আকাঙ্ক্ষিত সে পাত্র।

বিলেত-ফেরত ডক্টরেট পাওয়া ছেলে দেখে বহু পয়সা খরচ ক'রে মীরার পিসেমশাই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।

রমা বি. এ. পাস, দেখতেও সুশ্রী, মেমেদের মতো রং ছিল তার। এমন যোগ্য মিলন সাধারণত দেখা যায় না, সবাই সেই কথা বলাবলি করতে লাগল। কিন্তু বিয়ের পরই দেখা গেল বিলেত থেকে শুধু বিদ্যেই নিয়ে আসে নি তার বর—বদভ্যাসও এনেছে কিছু।

তার মধ্যে মদ্যপানের নেশাটাই সবচেয়ে প্রবল। তখনই লাঞ্চ এবং ডিনারের পূর্বে একটু না খেলে চলত না—পরে সেটা দিনরাতের সঙ্গী হয়ে উঠল। ফলে পৈতৃক সম্পত্তি তো গেলই, মোটা মাইনের চাকরিটাও রাখতে পারল না।

দুর্দশায় শেষ রইল না রমার—মাতাল হয়ে মারধোরও করত মধ্যে মধ্যে—কিন্তু বাবা-মা দুঃখ পাবেন বলেই অনেকদিন পর্যন্ত সে কথাটা চেপে ছিল সে। ছেলেকে মানুষ করার জন্য রমা ইদানীং বাধ্য হয়ে মাস্টারীর চাকরি নিয়েছিল—শেষে সেই সামান্য আয় থেকেও কেড়ে বিগড়ে টাকা নিয়ে মদ খেতে শুরু করল যখন তার বর—তখন আর রমা প্রতিবাদ না ক'রে পারল না।

আর তার ফলে একদিন তাকে থামে বেঁধে হাণ্টারের বাড়ি মেরে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলেন উচ্চশিক্ষিত স্বামীদেবতা।

রমাকে অগত্যা স্বামীর ঘরের মায়া কাটিয়ে ছেলের হাত ধরে বাপের বাড়িতে এসে উঠতে হ'ল।

অথচ—আর একদিকে সে তার ছোট মামাকে দেখেছিল।

ছোট মামা ছেলেবেলায়—যাকে বলে একটু বকে গিয়েছিলেন—ম্যাট্রিকটাও তাই পাস করতে পারেন নি।

মূর্খ ছেলে—নেহাৎ দাদামশায়ের প্রতিপত্তির জোরেই তাঁর অফিসে একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন। তার পর বিয়ে-থাও করেছেন। পৃথক সংসার ক'রে থাকেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা, অমায়িক ভদ্র ব্যবহার। কথাবার্তায় উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট—কে বলবে যে তিনি কোনদিন কলেজে পড়েন নি।

আর তেমনি আত্মীয়-স্বজন সকলের সম্বন্ধেই তাঁর মনে গভীর মমতা—তিনিই একমাত্র আত্মীয় তাদের—যিনি নিয়মিত সকলের খোঁজখবর রাখেন।

এই দুটো ছবি পাশাপাশি মনের পর্দায় ভেসে আসায় তার ভবিষ্যৎ স্বামী সম্বন্ধে খুব দুশ্চিন্তা বা আশঙ্কা বোধ করে নি সে।

তাছাড়া, ঐশ্বর্যের কথাটাও খুব ফেল্‌না বলে বোধ হয় নি।

গাড়ি বাড়ি, অগণিত দাসদাসী, মহার্ঘ্য অলঙ্কার, মূল্যবান শাড়ি—কোনটাই খুব তুচ্ছ জিনিস নয়।

এরই মধ্যে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করা—জীবনের মধুকোষ থেকে আহরিত সমস্ত মধু পাত্র পূর্ণ ক'রে ধরবে অপরে, হেলায় শুধু মর্জিমত সেটা পান করা,—খারাপ তো লাগেই নি, বরং যেন ভালই লেগেছিল—একটু নেশাও লেগেছিল মনে মনে কল্পনা ক'রে।

সে বেলা পালিতকে জবাব দিয়েছিল, 'বাবা আমাকে ভালবাসেন, বুদ্ধিসুদ্ধিও তাঁর খুব কম বলে জানি না। তিনি যখন এ বিবাহ দিচ্ছেন—ভেবেচিন্তেই দিচ্ছেন বৈকি!'

তবু বেলা পালিত বলেছিল, 'কিন্তু ছেলেটা ঠিক কেমন তা খোঁজ করা হয়েছে তো? স্বভাবচরিত্র খারাপ নয় তো? শুধুই বাউণ্ডুলে, না আরও কোন উপসর্গ আছে?'

'সে-সব খোঁজ না ক'রে কি আর বাবা দিচ্ছেন? ভাল ক'রেই খবর নিয়েছেন নিশ্চয়!'

বেশ নিশ্চিন্ত মনেই জবাব দিয়েছিল সে।

অবশ্য ওর বাবা খোঁজ ক'রেও ছিলেন। ছেলের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধেই বেশী ক'রে খবর নিয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে বহুলোকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই এ বিয়েতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

॥ ৪ ॥

খালি একটা কথা খোঁজ করেন নি ওর বাবা।

ওর শ্বশুর যত না ধনী ছিলেন, তত ছিলেন দাতা। চেক-বই খোলাই থাকত প্রার্থীদের জন্য। কেউ কোনদিন কিছু চেয়ে ফিরে যায় নি। প্রার্থনার কারণ বা প্রার্থীর যোগ্যতা কিছুই বিচার করতেন না তিনি।

আরও যেটা খোঁজ করেন নি—সেটা হচ্ছে ঐ অতবড় বাড়িটাও ওর শ্বশুরের নিজের নয়, মোটা টাকা—বোধ হয় হাজার টাকা ভাড়া দিতেন ওটার।

নিতান্ত গড়িমসি ক'রেই হয়ে ওঠে নি সেটা। বাড়ি করার কথাটা যতবার উঠেছে, ততবার চাপা দিয়ে দিয়েছেন ওর শ্বশুর।

আসলে ঝঞ্ঝাটটাকেই ভয় করতেন তিনি—তাছাড়া এসব নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় ছিল না। যতক্ষণ বাড়ি নিয়ে আলোচনা করবেন, ভাববেন—ততক্ষণে দু হাজার টাকা রোজগার হয়ে যাবে।

বিবাহের পর একটা বছর মীরাও কিছু বুঝতে পারে নি।

স্বচ্ছল সংসার—ঐশ্বর্যের সমারোহ; বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্য চারিদিকে।

স্বামীকেও মীরা সেই সময়টায় কিছুদিন কাছেই পেয়েছিল, নবীন যৌবনের সহজাত আকর্ষণে সে-ও স্ত্রীর সাহচর্য কামনা করেছিল সেই ক'টা মাস।

সুখে ও আনন্দে জীবনের তরী বয়ে চলেছিল যৌবন-সরসীর ওপর দিয়ে। ভেবেছিল সে সুখের বুঝি কোন দিন শেষ হবে না।

বেলা পালিতের কথা ভেবে করুণা হ'ত তখন।

তার পরই যেন একটা প্রবল ভূমিকম্পে সব ওলটপালট হয়ে গেল।

ওর শ্বশুর হঠাৎ মারা গেলেন—সামান্য দু'দিনের জ্বর উপলক্ষ ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে যেন সংসারটা একেবারে ভেঙে পড়ে গেল—বহুদিনের ঘুণধরা শালকাঠ যেমন একেবারে ছাতুর মতো হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ে—তেমনি।

দেখা গেল ওর শ্বশুরমশাই কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, একটি জীবনবীমা ছাড়া। অবশ্য একেবারে কিছু রেখে যেতে পারেন নি বললে ভুল বলা হবে—বিপুল এক অঙ্কের দেনা রেখে গেছেন। বীমা বাবদ যে টাকা পাওয়া যাবে তাতে সে দেনাও শোধ হবে না।

অতঃপর সবই গেল।

যেন ছায়াবাজীর মতই মিলিয়ে গেল সব। সিনেমার পর্দায় যেমন আলো নিভে গেলে ঘরবাড়ি গাড়ি মানুষ সব এক নিমেষে মিলিয়ে যায়—তেমনি।

গাড়ি দু'খানাই বেচতে হ'ল। সেই সঙ্গে বহুদিনের জমা আসবাবপত্রও।

ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ছোট্ট একটা বাড়িতে এসে উঠল ওরা। ওর দেওর তখনও পাস করে নি। ভাসুরের আয় শুধু ভরসা। কিন্তু সে আয়ও কমে গেল অনেকখানি।

আগে যারা ওঁর হাতে মামলা দিত, তারা ওঁর বাপের ভরসাতে—অনেক সময় তাঁকে খুশী করতেই দিত। এখন তাদের অনেকেই সরে পড়ল।

ভাসুর আগে দেওয়ানী মামলা করতেন—এখন সংসারের দায়ে ফৌজদারী আদালতে বেরোতে শুরু করলেন, কিন্তু তাতেও গ্রাসাচ্ছাদন চলা ভার হয়ে উঠল।

মীরার কাছে এ সমস্তটাই যেন স্বপ্নের মতো।

বিয়েটাও যেমন—আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত—তার সঙ্গে সঙ্গে এই অগণিত দাসদাসী, মহার্ঘ্য ফার্নিচার, স্বচ্ছন্দ স্রোতে প্রবাহিত মধুর অনায়াস জীবন, বহুমূল্য অলঙ্কার, বিচিত্র শাড়ি, যা কোনদিন চাইতে হয় নি, কামনা করতেও হয় নি, ভাববার বা চাইবার আগেই এসে গেছে—অকারণে, অযাচিত ভাবে; সিনেমা-থিয়েটার-জলসার নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন, প্রয়োজনাতিরিক্ত সুখাদ্যের স্তূপ।

শ্বশুর কে জানে কেন, প্রথম থেকেই মীরাকে একটু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেছিলেন। ফলে তার আদরের শেষ ছিল না।

না চাইতে শুধু নয়—না ভাবতেই সুখের উপকরণ তার ওপর বর্ষিত হ'তে থাকত।

এ-ও যেমন স্বপ্ন, তার পর এই আকস্মিক, অচিন্তিত দুঃখ—এই গল্পের মতো অবিশ্বাস্য সর্বনাশ—এও তেমনি স্বপ্ন।

প্রথমটাও বিশ্বাস হ'তে দেরি লেগেছিল, শেষেরটাও মেনে ও মানিয়ে নিতে দেরি লাগল।

এও বিশ্বাস হ'তে চায় নি সহজে। মনে হয়েছিল এটাই দুঃস্বপ্ন—এক সময়ে এটা ভাঙবে, আবার আগের সেই সুখ, বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে জেগে উঠবে বুঝি।

কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ—বুকের মধ্যে হিম-শীতল দুঃসহ বোঝার মতো উপলব্ধিটা আত্মপ্রকাশ করল একসময় যে—সেটাই ছিল স্বপ্ন, এইটাই বাস্তব।

সে সুখের দিন আর কোনদিনই আসবে না হয়ত জীবনে, কখনই আর ফিরে পাবে না সেই সোনালী মুহূর্তগুলিকে।

এখন থেকে এ-ই চলবে—কঠোর, রূঢ় বাস্তব ; নিশ্ছিদ্র দুঃখ ও দারিদ্র্য।

তবু যাঁরা আশা করেছিল এই আঘাতে অন্তত সহদেবের কিছু চৈতন্য হবে—কিন্তু তাও হ'ল না।

কারণ বিয়ের কয়েক মাস পরেই, শ্বশুর বেঁচে থাকতেই সহদেব আবার তার পুরাতন অভ্যস্ত জীবনে—ভবঘুরে বাউণ্ডুলের জীবনে ফিরে গিয়েছিল। বহুরাত্রে বাড়ি আসত, বেলা পর্যন্ত ঘুমোত। না কাজকর্ম, না সংসার কোনদিকেই কোন দিন দৃষ্টি ছিল না। বেলায় উঠে চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ত—বেলা দুটোয় এসে খেত। তারপর দিবানিদ্রা দিয়ে বিকেলে যে বেরোত, ফিরত রাত দুটো আড়াইটে তিনটেয়।

বলত রেওয়াজ করতে হয়।

গভীর রাত না হ'লে নাকি রেওয়াজ ঠিক হয় না।

নির্জন জায়গাও একটু চাই।

তাছাড়া সে ঠিক ইয়ার বন্ধু নিয়েও আড্ডা দেয় না। তারা সবাই সতীর্থ সমধর্মী, সঙ্গীত-রসিক।

তাদের সাহচর্যেও লাভ।

না, ওদের তাড়িয়ে কেউ দেয় নি এটা ঠিক—মা ছিলেন মাথার ওপর বলেই বোধ হয় সে রকম কোন চিন্তা মাথাতে আসে নি কারুর—কিন্তু তবু সকলের কাছেই দৃষ্টিকটু হয়ে পড়েছিল বৈকি ব্যাপারটা।

ভাসুর নিজে কিছু না বলুন, তাঁর স্ত্রী এতটা সহ্য করবেন কেন ? একটা লোক উদয়-অস্ত মুখের রক্ত তুলে মরে যাচ্ছে—সে সম্বন্ধে একটুকু বিবেচনাও যদি কারুর না থাকে তো তিনি চুপ ক'রে থাকবেন—এতটা আশা করাও অন্যায়।

তিনি ক্রমশ মুখ খুললেন ; মা-ও ছেলেকে না হোক ছেলের বৌকে—শোনাতে শুরু করলেন বাঁকা বাঁকা কথা।

স্ত্রীভাগ্যে ধন, বৌয়েরও একটা আয়পয় আছে। এমন বৌ-ই তিনি নিয়ে এলেন যে তাঁর সাজানো সংসারে আগুন লেগে গেল। রাজরাণী তিনি—হলেন ভিখিরী।

তাছাড়া ছেলেকে ফেরানো, মানুষ করার দায়িত্বও এখন স্ত্রীরই। কেমন মেয়ে সে—যে স্বামীকে বাগে আনতে পারে না ?

ক্রমে ক্রমে অহোরাত্রই এই বাক্যবাণের বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

তবু মীরা সবই সহ্য করে ছিল, স্বামীর অকর্মণ্যতা নিজের কায়িক পরিশ্রমে পুষিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছিল।

একাধারে ঝি ও রাঁধুনীর কাজ করত সে। ভোর চারটেয় উঠত, শুতে যেত রাত এগারোটায়।

এততেও তার ক্ষোভ ছিল না যদি সহদেব তার দুঃখটা বুঝত, যদি এতটুকুও চৈতন্য হ'ত তার।

বরং বাবা থাকতে যেটুকু সঙ্কোচ ছিল তার, এখন তাও রইল না। রাত একটার আগে কোনদিন বাড়ি আসত না।

যে মানুষ উপার্জন করে—তার অনাচার তবু সহ্য হয়, এ যে একেবারেই অসহ্য।

উপার্জনের চেষ্টা না করুক—সংসারের কাজ ক'রে দিয়ে একটু উপকারে আসবে, এ আশাটা তারা করতে পারে বৈকি!

কিন্তু এক দিন বাজার ক'রেও সাহায্য করত না সে।

মীরা বহু বুঝিয়েছে, বহু অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি করেছে।

কিন্তু সহদেব নির্বিকার, সবটাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। খুব বাড়াবাড়ি হ'লে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে।

সে আরও জ্বালা। দুপুরে খেতে আসবে কিনা তাও বলে যেত না, ভাত নিয়ে বসে থাকতে হ'ত। এবং ভাত না খেলে গোপনে সেগুলো সরাতে হ'ত। নইলে গালাগালির অন্ত থাকত না। আর সত্যিই, দরিদ্রের সংসারে অন্নের অপচয় সহ্য করবে কে?

রাত্রে বাড়ি ফেরা নিয়েও জ্বালা—যার ঘুম ভাঙবে, সে-ই রাগ করবে, কথা শোনাবে।

সে কথা সহদেবের গায়ে বিঁধত না—বিঁধত মীরাকেই।

অগত্যা সে-ই ক্লান্ত দেহে জেগে বসে থাকত, গলির মোড়ে পদশব্দ পেয়েই নিঃশব্দে নেমে এসে দোর খুলে দেওয়ার জন্য।

দিনের পর দিন। রাতের পর রাত চলত এমনি।

এতখানির বদলে সামান্য একটু সহানুভূতিও যদি পেত মীরা!

যদি এতটুকু লজ্জা বা অনুশোচনার ছাপও দেখতে পেত সদা-আত্মতৃপ্ত সেই মুখে!

কৃতজ্ঞতা আশা করে না—কিন্তু একটু স্বীকৃতি, মীরা যে এতটা কষ্ট করছে তার জন্য, এ সম্বন্ধে এতটুকু একটু উপলব্ধিও কি আশা করতে পারে না সে?

সহদেবের ভাবভঙ্গীতে মনে হ'ত একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক আচরণই সে করছে স্ত্রীর সঙ্গে—স্ত্রীর কাছ থেকে এইটেই প্রত্যেক স্বামীর ন্যূনতম দাবি।

তাছাড়া, তার জীবনযাত্রার জন্যও যে কারুর কাছে লজ্জিত হবার কিছুমাত্র কারণ আছে, তাও সহদেব মনে করত না।

এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিল সে—প্রথম প্রথম এ প্রশ্ন করেছে বৈকি মীরা; সহদেবও সরল ভাবেই জবাব দিয়েছে তার।

কোথায় কোন্ ওস্তাদ গাইতে গিছলেন—সেইখানে সে-ও গিয়েছিল, ভেতরে ঢুকতে পায় নি—বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল রাত দুটো পর্যন্ত; নয় তো অমুক ওস্তাদের ভৈরোঁটা শোনবার আশায় পর পর তিন দিন সে দাঁড়িয়ে থাকছে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায়, কিন্তু এমন হারামজাদা ওর সাগরেদগুলো যে একজনও ভৈরোঁ শেখবার কথা তুলছে না; তবে সে-ও অমুক চাটুজ্যের ছেলে—যদি এক বছর এমনি দাঁড়াতে হয় তো তাও কবুল—শিখে তবে ছাড়বে।

কিংবা, আরও সরল ভাবে এক-একদিন স্বীকার করত, আর কিছুই হয় নি—বেচার বৈঠকখানায় আড্ডা দিয়েই কেটে গেছে, অথবা পক্কা ছাড়লে না, তাদের থিয়েটারের ক্লাবে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওদের নিয়তিকে (বা দরবেশ বা সন্ন্যাস'—যে নাটকে যা) গানটা একবার গটিয়ে দিতে।

প্রথম প্রথম মীরার ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। অবাক হয়ে প্রশ্ন করত, 'তুমি এমনি অকাজে আড্ডা দিয়ে এত রাত ক'রে এলে!'

'বাঃ! এগুলো অকাজ নাকি? বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু আড্ডা দেব না? কিংবা তারা যদি ধরে কোন কাজের জন্যে—?'

'দ্যাখো, তার একটা সীমা আছে। যার কোন সামর্থ্য নেই কোনদিকে, সে যদি রাত তিনটে চারটেয় বাড়ি ফেরে তো তার জন্যে কেউ জেগে বসে থাকে না দোর খুলে দিতে—'

'তুমিই বা থাক কেন? আমি এসে দমাদম দোরে লাথি মারব—যার ঘুম ভাঙবে আগে, সে-ই খুলবে!'

'তুমি থাম। তোমার ঐ কথা শুনলে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। এক পয়সা রোজগারের নাম নেই—উনি এসে দমাদ্দম দোরে লাথ মারবেন।...তা হ'লে এই যে মাথার ওপর আশ্রয়টুকু আছে, তাও ঘুচবে। বড় ভাই সেইদিনই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে!'

'ইস্! অমনি দিলেই হ'ল কিনা। এখনও মাথার ওপর মা আছে না?'

এ:কম আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন লোকের সঙ্গে আলোচনা করাও যায় না। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ত মীরা।

বড় জোর প্রশ্ন করত এক-একদিন, 'আচ্ছা কেন, কেন এমন ক'রে বাইরে এত রাত কাটাও? আমার সঙ্গ কি অসহ্য বোধ হয় তোমার?'

'তা কেন—বা রে! এ আবার কি কথা। তুমি আছ তোমার মতো। বৌয়ের সঙ্গে এসব কাজ—বা রে!...আমাকে উন্নতি করতে হবে না। গান শিখে—'

'শেখা তো কত। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই—নিধিরাম সর্দার! পয়সা নেই ওস্তাদ রাখতে পার না—শুধু সারারাত বাইরে কাটিয়ে এলেই গান শেখা হয়?'

'আরে পয়সা নেই বলেই তো—অমনি বাইরে বাইরে ঘুরে তুলতে হয় একটু একটু ক'রে দামী জিনিস। বসে একটু রেওয়াজ করারও তো জায়গা নেই, অমন ক'রে ঘুরে ঘুরে শেখা ছাড়া উপায় কী বলো? যেদিন কিছু থাকে না সেই গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে রেওয়াজ করি। রাত কত হয় সে কি খেয়াল থাকে তখন? হাতে কি আমার ঘড়ি আছে?'

'আর বেচার বৈঠকখানায় কি পঙ্কার ক্লাবে? সেখানেও কি দামী জিনিস পড়ে আছে সব? সেখানেও কি তোমার তপস্যা চলে?'

'তুমি কিচ্ছু বোঝ না। একেবারে ছেলেমানুষ। মাঝে মাঝে একটু আধটু ফাঁক না পেলে, মানে একটু আড্ডা দিতে না পারলে কি মেজাজ ভাল থাকে? আর্টিস্টদের ওটুকু চাই। রোজ রোজ কাজ করলে মাথা ঠিক থাকে না!'

'চুপ করো। যেমন তোমার কাজ—তেমনি তুমি আর্টিস্ট!'

'দেখে নিও, দেখে নিও। কাজ কিনা দেখে নিও। এক দিন বুঝবে!' বেশ প্রশান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে পাশ ফিরে শুত সহদেব। বড়জোর তার মধ্যেই জড়িত কণ্ঠে বলত, 'কাল একটু সকাল সকাল চা দিও—বটকেষ্টর বাড়িটা খালি পড়ে থাকবে—ঐখানে গিয়ে রেওয়াজ করব!'

তার পরই নিঃশ্বাসের শব্দ গভীর হয়ে আসত—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনের সুগভীর নিদ্রা।

॥ ৬ ॥

এমনি ক'রে এক-আধ দিন নয়, এক-আধ মাসও নয়—কয়েকটি বছরই কাটিয়েছিল মীরা।

কিন্তু একসময় আর পারে নি।

ভাসুরের কাছে প্রস্তাব করেছিল চাকরি খুঁজে দেবার জন্য—তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন কথাটা। বাবাও মারা গিয়েছিলেন, তবু ভাইয়েরা ছিল—কিন্তু সে জানত শ্বশুরবাড়ি থেকে লাঞ্ছিত হয়ে ভাইয়ের সংসারে গিয়ে ওঠার মতো অপমান আর নেই—তাই সে চেষ্টাও সে করে নি।

তবু সহ্যের সীমা অতিক্রম করাতে সেই অপমানই বরণ করতে হ'ল তাকে।

গহনা শ্বশুরের মৃত্যুর পর একে একে সবই গিয়েছিল। সামান্য যা ধুলিগুঁড়ি ছিল, শেষের দিকে সহদেব নিতে শুরু করল।

তার নাকি গান শিখতে হবে—গান শিখে নিতে পারলে আর কোন দুঃখ থাকবে না—তখন মীরার সব গহনা আবার গড়িয়ে দেবে সে। কী করবে—ওস্তাদগুলো হয়েছে যে সবাই চশমখোর। তবু তো যা কষ্ট সহদেব করেছে! এতকাল তো বড় বড় গাইয়েদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যা কিছু শিখেছে বলতে গেলে। বিদ্যাসাগরের চেয়ে সে কম নয়—এদিক দিয়ে অন্তত। কিন্তু এখন একটু সামনা-সামনি না তুলে নিতে পারলে—

'তা কিছু তো শিখেছ—এখন দু'একটা টিউশনিও তো করলে পার?' বলেছিল মীরা।

আজকাল বলা ছেড়ে দিয়েছে—তবু সেদিন না বলে পারে নি।

এতখানি জিভ কেটে সহদেব উত্তর দিয়েছিল, 'বাপ্‌রে! এ কথা মুখে এনো না। এতে শিক্ষা হয় না। শিখতে না শিখতে যারা টিউশনি ক'রে বেড়ায় তারা শিক্ষাকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করায়, সে আমি পারব না।'

না। কিছুই পারে নি সে। শুধু কাপড়-জামার দরকার হ'লে নির্লজ্জ ভাবে তার কাছে চাইতে পেরেছে আর ওস্তাদের মাইনে যোগাড়ের দরকার হ'লে শেষ কুচি সোনাটিও ওর কাছ থেকে বার ক'রে নিতে পেরেছে। তাও মোটা কাপড়-জামা তার চলবে না—'আর্টিস্টদের সঙ্গে মিশি, একটু ভাল কাপড়-জামা না হলে আমার চলে না'। এই ছিল তার যুক্তি।

শেষে যেদিন সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করল, সেদিনকার কথাটা মনে আছে তার।

তিন দিন পরে বাড়ি ফিরেছিল সহদেব—অসময়ে ; বাড়ি পৌঁছেছিল বেলা তিনটেয়।

ইদানীং এমন ডুব মারত প্রায়ই—বলত জলসা ছিল, বলত অমুক রাজার বাড়ি ছিলাম ক'দিন। তাই এরকম ক্ষেত্রে তার জন্য ভাত রাখা ছেড়ে দিয়েছিল মীরা ; যে সংসারে প্রতিটি পাই হিসাব ক'রে খরচ করতে হয়, সেখানে নিত্য অপচয় করা চলে না।

কিন্তু সহদেব সেদিন এসেই ভাত চাইল। এবং ভাত নেই শুনে একান্ত অবুঝের মতো, শিশুর মতো রাগারাগি করতে লাগল। সে যে আসবেই—এ সংবাদ তাদের জানার কথা নয়—এ যুক্তির বদলে সহদেব সটান বলে বসল, 'আসি বা না আসি, আমার ভাত থাকবে না ? নষ্ট আবার কি ? আমি খেলেও খরচ হ'ত—এও না হয় খরচ হবে। এই তো ! তা বলে আমি ক্ষিধের সময় ভাত পাব না ?'

ওর সেই চড়া গলার শব্দ মীরার বড় জায়ের কানে পৌঁছেছিল।

তিনি আর সহ্য করতে পারেন নি, বেরিয়ে এসে যাচ্ছেতাই বলেছিলেন দেওরকে, বলেছিলেন, 'এক কড়ার মুরোদ নেই, আবার এসে লম্বা-চওড়া করতে লজ্জা করে না। যেখানে ছিলে সেইখানে ভাত খাওগে ! উনি ক'দিন পরে দয়া ক'রে কবে বাড়ি আসবেন, তার জন্যে ভাত রেখে বসে থাকব আমরা—না ? কত পয়সা দাও সংসারে, যে ভাত চাইছ ? ক'টা পয়সা দিয়েছ আজ পর্যন্ত ?... এ সংসারে আর তোমার ভাত কোনদিন হবে না, যাও আজই পরিবারের হাত ধরে বেরিয়ে যাও যেখানে খুশি। আর কোনদিন তোমার মুখ না দেখি এখানে।'

এত চড়া কথা হয়ত ওর শাশুড়ীরও সহ্য হয় নি—কিন্তু তিনি নীরবে চোখের জল মোছা ছাড়া কিছুই করতে পারেন নি।

প্রতিবাদের একটি শব্দও মুখে যোগায় নি তাঁর। কী আর বলবেন ! কোন্ অধিকারে বলবেন ?

আঘাত যতই লাগুক, তখনও অসহ্য বোধ হয় নি। এতদিনে খানিকটা সহ্য করার শক্তি বেড়েও গিয়েছিল বৈকি !

অসহ্য হ'ল অন্য কারণে—বিকেলবেলা।

যখন এত কথার পরও সহদেব অপ্রতিভের হাসি হেসে, 'এই নাও ! এই নাও ! এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা ! আমি বলছি আমার বৌকে—' বলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল ; তখনও তবু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছিল মীরা। কিন্তু যখন পাঁচটার

সময় ঘুম ভেঙে উঠে অম্লানবদনে চায়ের ফরমাশ ক'রে বলেছিল, 'আর দেখো দিকি—অমনি কিছু একটু খাবার মতো খুঁজে পাও কিনা, মুড়ি বা বিস্কুট-টিস্কুট ? বৌদির ঘরে কি আর ছেলেমেয়েদের এক-আধখানা বিস্কুট নেই ? ক্ষিদেয় যে পেট জ্বলে যাচ্ছে।' তখন আর সহ্য করতে পারে নি।

হঠাৎ সমস্ত সহ্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছিল। একেবারে—ঘরের বাইরে শুধু নয়—বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল সে। এবং সেই একবস্ত্রে (ইদানীং একটিমাত্র বস্ত্রেই ঠেকেছিল তার) পায়ে হেঁটে এসে উঠেছিল বাপের বাড়ি।

তার পর সহদেব আসে নি, হয়ত আসতে সাহস করে নি—তবে ওর ভাসুর এসেছিলেন।

ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও করেছিলেন, কিন্তু মীরা আর রাজী হয় নি। দূর থেকে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলেছিল, 'আপনি ঢের সহ্য করেছেন, আপনার মতো ভাসুর মহাভাগ্যে মেলে। আপনার বা দিদির কোন দোষই আমি দিই না—তবে আমারও আর সহ্য হচ্ছে না দাদা। আমাকে আপনি ছেড়ে দিন, আমি নিজের ভাগ্যটা একটু বেয়েচেয়ে দেখি। ভায়ের সংসারে এসে গলগ্রহ হবার লজ্জা আর অপমান যখন স্বীকারই করেছি, তখন আর ওখানে ফিরে যাব না। আমাকে মাপ করুন।'

ভাসুর ম্লান মুখে ফিরে গিয়েছিলেন।

হয়ত তার সবটাই বিনা বেতনের কম্‌বাইন্‌ড হ্যাণ্ড—ঝি ও রাঁধুনী চলে আসার দুঃখ নয়, হয়ত এই অপরিসীম সহনশীলা নতমুখী ভ্রাতৃবধূটির জন্য একটু সহানুভূতিও অনুভব করেছিলেন মনে মনে। হয়ত একটু স্নেহও অবশিষ্ট ছিল তাঁর অন্তরে কোথায়—এই মেয়েটির জন্য। হয়ত বংশের কথাও চিন্তা করেছিলেন।

তাঁর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে মীরারও যে কিছু কষ্ট হয় নি তা নয়—তবু সে নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল ছিল।

তার পর অবশ্য অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে তাকে।

কর্পোরেশন স্কুলে মাস্টারী নিয়ে একে একে বি. এ. পর্যন্ত পাস করেছে সে। তখন বড় ইস্কুলে কাজ পেয়েছে, সেইখান থেকেই এম. এ. পাস করেছে।

আজ সে সেই বড় ইস্কুলেরই হেড্‌মিস্ট্রেস। আলাদা বাসা ভাড়া ক'রে থাকে।

না, ভায়েরা ভাজেরা কেউ অসদ্ব্যবহার করে নি। কারণ মীরা ঠিক গলগ্রহ হয়ে তাদের সংসারে তিনটে মাসও ছিল না—কিন্তু তবু সকলকার চোখেচোখেই ওর

প্রতি যে সহানুভূতি, যে করুণা ঝরে পড়ত অহরহ—সেইটেই সহ্য হয় নি ওর।

তার চেয়ে এ-ই ভাল। সি-আই-টির ছোট্ট ফ্ল্যাট্ একটি পেয়েছে, দিনরাতের ঝি রেখেছে, ছোট সংসার - কোন ঝামেলা নেই। প্রাচুর্যও যেমন নেই, আরামেরও অভাব নেই। রবিবারে রবিবারে ভায়েদের ওখানে যায়—ভাইপো-ভাইঝিদের জন্য প্রচুর উপহার নিয়ে যায়—ফলে তারা ওর জন্যে পাগল।

এক কথায় বেশ আছে সে।

॥ ৭ ॥

কিন্তু কিছুদিন থেকে তার এই শান্তির, এই নিশ্চিন্ত আরামের মূলে যেন একটা আঘাত লেগেছে।

সে আঘাত বাইরে কোথাও থেকে আসে নি। নিজের মন থেকেই এসেছে।

একটা কুটিল সংশয় দেখা দিয়েছে মনে—সত্যিই কি বেশ আছে সে ?

বেশ থাকতে পারত সে—অনেকদিনই পারত, যদি আর একটু সাংসারিক বা ব্যবহারিক বুদ্ধি থাকত তার।

কোন্ লগ্নে তার জন্ম তা সে জানে না—সম্ভবত বৃষ লগ্নেই, নইলে তার সারা জীবনটাই এমন কলুর বলদের মতো চোখ ঢাকা অবস্থায় কাটবে কেন ?

প্রথম জীবনে শ্বশুরবাড়ি ভূতের মতো খেটেছে যখন—কোথাও থেকে কোন সহানুভূতি, সহযোগিতা এমন কি এতটুকু মিষ্টি কথাও পায় নি—তখনও তো কোন দিন নিজের অবস্থাটা খিতিয়ে ভাবে নি।

ভাবে নি একবারও যে এমন ক'রে কতদিন কাটবে, ভবিষ্যতে তার কী হবে।

এ বন্ধন থেকে এই ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কিনা, জীবনে আবার কখনও, আর কোথাও, নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করা সম্ভব কিনা।

দেহ ও মনের সব চোখ বুজিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিল—সেই ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে।

তার পর যখন ছুটে বেরিয়ে এল—যখন শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেল সে সেই জগদ্দল ভারের বন্ধন থেকে—তখনও কি চারিদিকে তাকিয়ে ছিল ?

তখনও কি চেয়ে দেখেছিল বাইরের এই চলমান জীবনপ্রবাহের দিকে ? যেখানে আনন্দের সহস্র উৎস অবারিত, ভোগের সহস্র উপকরণ স্তরে স্তরে সজ্জিত!

তখনও তো নিজের সুখের কথা, নিজের অন্তরের কথা ভাবে নি একবারও।

শুধু কী ক'রে উপার্জন করবে, কেমন ক'রে আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করবে—ভাইদের গলগ্রহ হয়ে থাকার লজ্জা ও অপমান থেকে অব্যাহতি লাভ করবে, এই চিন্তাই করেছে শুধু—সেই চেষ্টাই দেখেছে।

তপস্যাই করেছে বলতে গেলে। একমনে, একাগ্রচিত্তে।

তার পর যখন স্বাবলম্বিতা এল—তখনও তো থামে নি, নিজের দিকে তাকায় নি, নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসে নি।

কাজ—শুধু কাজ।

আরও উন্নতি। আরও এগিয়ে যাওয়া।

কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনই শুধু নয়—সেই সঙ্গে একটু স্বাচ্ছন্দ্য, একটু আরাম—ভবিষ্যতের একটু নিরাপত্তা।

নিজস্ব ফ্ল্যাট, নিজস্ব দাসী এবং মোটা টাকার জীবনবীমা।

যখন বুড়ো হবে, রিটায়ার করতে হবে—তখন প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ও জীবন-বীমা মিলিয়ে যা পাবে—তাতে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গা দেখে গিয়ে বাসা বাঁধা কষ্টকর হবে না—বাকী জীবনটাও বিলাসে না হোক, স্বাচ্ছন্দে কেটে যেতে পারবে।

এই ছিল সেদিনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র সাধনা।

এর বাইরে যে কোন কথা আছে, আর কিছু চিন্তা সম্ভব, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম ছাড়াও যে জীবনের অন্য কোন দিক আছে ভাববার—আর সে দিকটাও যে আদৌ উপেক্ষণীয় নয়, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে যে সে দিকটাও ভাবা উচিত—তা সে মনেও করে নি কখনও।

আজ সে-লক্ষ্যে পৌঁছেছে সে।

আজ আর ছুটোছুটি নেই, উৎকণ্ঠা উদ্বেগ কিছু নেই, স্কুলে পড়িয়ে টিউশনী ক'রে এসে আবার রাত জেগে পড়বার তাড়া নেই।

ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা নেই—নেই বর্তমানের চিন্তা।

না, টিউশনীও নেই। ও উঞ্ছবৃত্তি আর করবে না সে। দরকারই বা কি? সে যা পায় স্কুল থেকে—তার একার পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিছু কিছু পরীক্ষার খাতা আসে- তাতেই তার পুজোয় বা গ্রীষ্মে বেড়াতে যাবার বাড়তি খরচা উঠে যায়। বাইরের থেকেও কিছু কিছু খাতা পাচ্ছে সে আজকাল—অমিয়বাবুর কল্যাণে—তাতে বরং আজকাল কিছু উদ্বৃত্তই থাকে—ভ্রমণের খরচা চালিয়েও।

অমিয়বাবুর কল্যাণে—

হ্যাঁ—অমিয়বাবুর কল্যাণে অনেক কিছু হয়েছে তার, শুধু নিজের চেষ্টায় ঠিক এতটা হ'ত না।

অমিয়বাবুর কথাটা মনে হ'তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মীরার।

আজ তাঁর কথাটাও—নিজের সমগ্র জীবনের সুবিপুল দুর্ভাগ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ক'রে মনে পড়ছে।

নতুন ক'রে দেখছেও সে তাঁকে—সেই সঙ্গে নিজেকেও। নিজের নির্বুদ্ধিতাও যেন স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়ছে।

বেচারী অমিয়বাবু!

নিজেকে নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল মীরা যে, তাঁর দিকে কখনও তাকাতে পারে নি। আসলে হয়ত তাকাবার কথা মনেই হয় নি।

নিজের দিকেও তাকায় নি যে!

তা যদি তাকাত—যদি নিজের কথা ভাবত একটুও—আজকের এই পরিপূর্ণ অথচ শূন্য, একান্ত ব্যস্ত ও একান্ত নিঃসঙ্গ জীবনের ছবিটা সেদিন হয়ত দেখতে পেত।

আর তা হলে অমিয়বাবুর দিকটাও ভাববার কথা মনে পড়ত।

বুঝতে পারত যে শুধুই পরোপকার ক'রে মানুষ সুখী তৃপ্ত বা পরিপূর্ণ হ'তে পারে না। আরও কিছু চাই তার, আরও কিছু প্রয়োজন থেকে যায় এ সবের বাইরেও। শুধু দিয়েই মানুষের সব শেষ হয় না, পাওয়াও তার দরকার কিছু।

আর—আর তা হ'লে আজ আর এই দৈন্য প্রকাশ করতে হ'ত না তাকে। এই একান্ত অবাঞ্ছিত ও দুঃসহ কাঙালপনা।

রিক্ততার এই চরম স্বীকৃতির লজ্জা থেকে অব্যাহতি পেত সে।

আবার সুখী—সুখী শুধু নয়, পরিপূর্ণই হ'তে পারত।

জীবনের অর্থ খুঁজে পেত সে।

কী না করেছেন অমিয়বাবু ওর জন্যে!

অমিয়বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক, সাহিত্যিক হিসাবেও বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত। জীবনে সুখী হবার, সার্থক হবার পূর্ণ অধিকারই ছিল তাঁর।

সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি জীবনকে সুখী করবারও। একটি স্নিগ্ধ শান্তিময় নীড়ই তাঁর প্রাপ্য ছিল। প্রসন্ন একটি আশ্রয়। আনন্দমুখর একটি গৃহকোণ।

মীরার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তখনও তিনি তারুণ্যের কোঠা একেবারে পার হন নি।

আজও তাঁর ললাটে যে কয়টি রেখা স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে, সহস্র প্রসন্নতাতেও যা আর মিলোতে চায় না—চর্মে দেখা দিয়েছে যে শৈথিল্য—তা যে শুধু বয়সেরই ফল—এমন কথাও বলা যায় না।

হয়ত তার জন্য মীরারও দায়িত্ব আছে কতকটা।

নইলে যে মানুষ একদা এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আগেই তাঁর অটুট স্বাস্থ্য এবং অপূর্ব কান্তিময়তা লোকের চোখে পড়ত, সে মানুষ এই ক'টি বছরেই এমন

ভাবে বুড়িয়ে যাবেন কেন ?

অমিয়বাবু ওর দাদার সামনের বাড়িতেই থাকতেন।

অকৃতদার—ভাই-বোনদের দায়িত্ব বহন করতেন হাসিমুখে, বই কলেজ এবং ছাত্রছাত্রী—এর বাইরের জগতের সঙ্গে বিশেষ সংস্রব ছিল না।

কী সূত্রে যেন—সম্ভবত ওঁর বোনের আর মীরার বৌদির যোগাযোগেই—ওর কাহিনীটা তাঁর কানে পৌঁছেছিল।

তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। প্রশংসাও করেছিলেন ওর দৃঢ়চিত্ততার।

নিজে থেকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন ওকে সাহায্য করতে।

বস্তুত তাঁর সুপারিশে—সুপারিশ কেন সক্রিয় চেষ্টাতেই—কর্পোরেশন ইস্কুলের চাকরিটা পায় মীরা।

একেবারে অসহায় পরমুখাপেক্ষিতা থেকে, একান্ত গলগ্রহ হয়ে থাকার নিদারুণ লজ্জা থেকে অত সহজে অব্যাহতি পেয়েছিল সেদিন তাঁরই অনুগ্রহে।

পাড়ার কাউন্সিলর অমিয়বাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্য একটি পল্লীর কাউন্সিলর তাঁর ছাত্র। এই দু'জনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও পরিশ্রমেই অত সহজে চাকরি মিলেছিল তার।

বৌদির সঙ্গে ওঁদের বাড়ি গিয়েছিল সে, অমিয়বাবুও তাকে সঙ্গে ক'রে কাউন্সিলরদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেন নি কোনদিন।

সহানুভূতি করেছেন কিন্তু তার বদলে কখনও কোন সুযোগ নেন নি। সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রেখে চ'লেছেন বরাবরই।

এমন কি নিজের বাড়িতে যেতে বলেন নি কোন দিন—মীরার প্রয়োজনেও তার বাড়িতেই এসেছেন।

সকলের সামনে সহজ ভাবেই আলাপ করেছেন। নিভৃত অবসর খোঁজেন নি।

বরং ঘনিষ্ঠতা কিছু করতে হয়েছে মীরাকেই।

কারণ আরও অনেক সাহায্য প্রয়োজন হয়েছে তার, বার বার যেতে হয়েছে তাঁর কাছে, নিজে থেকেই।

বইয়ের দরকার হয়েছে, পড়া বুঝে নেওয়ারও দরকার হয়েছে অনেক সময়।

এমন কি—পরীক্ষার সময় ফীয়ের টাকাও নিতে হয়েছে একবার ওঁর কাছ থেকে হাত পেতে। অন্য কোনও উপায়েই সংগ্রহ করা যায় নি সেটা।

এ সব অত্যাচারই হাসিমুখে সয়েছেন তিনি। দেড়শ টাকার কম যিনি সপ্তাহে

তিন দিন ছেলে পড়ান না—তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকেছেন ওর জন্য। অন্য অধ্যাপকদের দিয়েও খাটিয়ে নিয়েছেন। সবাইকেই সম্ভবত ওর কাহিনী শুনিয়ে বেগার দেওয়াতে রাজী করিয়েছেন।

বই বিনামূল্যে যোগাড় ক'রে দিচ্ছেন মুখে জানালেও মীরা বুঝেছে যে তিনি কিনেই দিচ্ছেন। মোটামোটা টাকার বই অতগুলো কেউ যে খুব সহজে খয়রাত করে না—এ জ্ঞান ততদিনে হয়েছে মীরার।

বি. এ. পাস করবার পর এই ইস্কুলে চাকরি পাওয়ার মূলেও তিনি। এ ইস্কুলের তিনি প্রেসিডেন্ট। তিনিই ওকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নেন—এবং সেক্রেটারি থেকে শুরু ক'রে প্রতিটি মেম্বার, মায় হেড্‌মিস্ট্রেস পর্যন্ত প্রত্যেকেরই একটি ক'রে আশ্রিত প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও নিজের ব্যক্তিত্বের জোরেই ওর দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে দেন।

অমিয়বাবুকে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখত—তাই তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে 'না' বলতে পারে নি কেউ।

তারপর তিনিই এম. এ. পড়বার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।

এম. এ. পাস করার পর বি. টি. পাস না করা সত্ত্বেও হেড্‌মিস্ট্রেসের পদ যে সে পেয়েছে তার জন্যও অমিয়বাবুই দায়ী। তাঁরই অমানুষিক চেষ্টায় ও ব্যক্তিগত প্রভাবে এটা সম্ভব হয়েছে।

এসব ব্যাপারে যে কত প্যাঁচ থাকে, কত বাধা এসে হাজির হয়— কত অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়—সে কথা তো মীরারও অজানা নেই!

এই সমস্ত অনুগ্রহ—অনুগ্রহ বলে আজ আর তাঁকে ছোট করতে চায় না মীরা—এই অকারণ স্নেহের বদলে কী দিতে পেরেছে তাঁকে সে?

কিছুই না।

শুধু নিয়েই গেছে দু হাত ভরে দেবার কথা তার মনে পড়ে নি কোন দিন।

ঋণের পর ঋণই বেড়ে গেছে—আর সে দু হাত পেতে নিয়েছে—যেন এতে তার জন্মগত অধিকার, দাবি। যেন এমনি নেওয়ার কথাই ছিল তার চিরকাল।

অমিয়বাবু কি সেদিন ওকে শুধু অনুগ্রহই করেছিলেন?

অনাথিনীর প্রতি অনুকম্পা?

দুঃখিনীকে সহানুভূতি?

সুকোমল চিত্তবৃত্তি এসব, প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। ওঁর মতো লোকের এইটেই আদর্শ কিন্তু তবু, তার জন্য কি মানুষ এতটা করতে পারে?

আজ বুঝছে, আজকাল বুঝছে—যে তা পারে না।

সাধারণ সহানুভূতি বা অনুকম্পা ছাড়াও কিছু ছিল। প্রবলতর কোন অনুভূতি।

কিন্তু অন্ধ সে—সেদিকে চেয়ে দেখে নি। দেখতে পায় নি।

অমিয়বাবুরও সহজাত ভদ্রতায় বেধেছিল, মুখ ফুটে কোনদিন মনের কথাটা বলতে পারেন নি।

ওর মনের রুদ্ধ দুয়ারের বাইরে দীন ভাবে অপেক্ষাই করেছেন—যদি কোনদিন তার কপাট আপনি খোলে।

আজ সবই পরিষ্কার দেখতে পায় মীরা।

কতদিন কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারেন নি অমিয়বাবু। সঙ্কোচ, চক্ষুলজ্জা—ওর চোখে ছোট হয়ে যাবার ভয়, হয়ত এমনি সহস্র কারণ এসে তাঁর আবেগের পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

বুকই ফেটেছে—মুখ ফুটতে দেন নি।

একটু একটু ক'রে অকালে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন তিনি।

বিবাহ করেন নি—জীবনে অন্য কোন আনন্দও নেই। ভাই-বোনরা মানুষ হয়ে গিয়েছে, যে যার জীবনে প্রতিষ্ঠিত—প্রায় সবাই অন্যত্র চলে গিয়েছে। একা থাকেন অমিয়বাবু, একেবারে একা।

তারই মতো একা।

নিশ্চিন্ত হয়ত—কিন্তু নিসঃঙ্গ। ব্যস্ত অথচ কর্মলক্ষ্যহীন। জীবিত কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যশূন্য।

অথচ কেন যে এই সহজ সত্যটা দেখতে পায় নি মীরা—এতকালের মধ্যে একদিনও—তা সে জানে না। হয়ত সে অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক, একান্ত স্বার্থপর বলেই। নইলে নিজের প্রয়োজন যে এমনভাবে মেটাচ্ছে তারও যে কোন প্রয়োজন থাকা সম্ভব—সে কথাটা একবারও তার মাথায় আসে নি কেন?

একদিন মাত্র কথাটা তুলেছিলেন অমিয়বাবু—সে-ও অন্তত বছর তিনেক আগে।

নিজের কথা অবশ্যই বলেন নি; সে প্রকৃতিই নয় তাঁর।

বলেছিলেন সাধারণ ভাবে, প্রসঙ্গত।

'আচ্ছা মীরা, জীবনটা কি এমনিই কাটিয়ে দেবে? এমনি একা, নিঃসঙ্গ? পারবে এইভাবে থাকতে চিরকাল?'

'আপনিও তো দিচ্ছেন। এ প্রশ্ন তো আপনাকেও করা যায়।'

মৃদু হেসে বলেছিল মীরা। ভেবেছিল খুব একটা বুদ্ধির কথাই বলছে সে।

'আমি ?...হয়ত বাধ্য হয়েই আমাকে কাটাতে হবে। হয়ত আমার ইচ্ছা ছিল না—তবুও। হয়ত উপায় নেই।' জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন অমিয়বাবু।

'আমারও কি তাই নয় ?'

'কেন তুমি তো ইচ্ছা করলে অনায়াসেই নতুন ক'রে সংসার পাততে পার—আইনে যাতে না আটকায়, সে ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না।'

'না না। ছি !' তাড়াতাড়ি বলে উঠছিল মীরা, 'আবার এই বয়সে নতুন ক'রে একটা লোককে ধরে ঘর বাঁধা ! মনে করলেই কেমন লাগে।...তাছাড়া বরাতে সুখ থাকলে একবারেই হ'ত। উপকরণ তো সবই ছিল—আমারই ভাগ্যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল বৈ তো নয়। আবার কোন্ সাহসে নতুন ক'রে রিস্‌ক্ নেব বলুন।'

'তা বটে।' বলে চুপ ক'রে গিয়েছিলেন অমিয়বাবু।

এ কথাটা সেদিন তিনি মুখ ফুটে বলতে পারেন নি যে, চেনা-জানা লোককে নিয়ে, যাচাই-করা,—মনের মতো মানুষ নিয়ে নতুন ক'রে ঘর বাঁধার ঝুঁকি নেওয়া চলত, আর সে মানুষ কাছেই আছে। সে ওর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করতে পারলে ধন্যও হয়ে যেত।

আরও বলতে পারেন নি যে, অদৃষ্ট বারবারই এক লোককে নিয়ে রসিকতা করে না—দুঃখের পর সুখই আসে, অশান্তির পর শান্তি।

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দিতে পারেন নি যে ওর জীবনেই দুঃখের পর অন্তত কিছুটা সুখ এসেছে। এসেছে নিশ্চিন্ত জীবনের আশ্বাস। এখন সেই জীবনে একজন সঙ্গী নেওয়া চলতে পারে অনায়াসেই।

এসব কিছুই বলতে পারেন নি তিনি।

শুধু আর একটি নতুন আশা-ভঙ্গের বেদনা, নতুন একটি আঘাত বুকে চেপে নিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিলেন।

সে বেদনা শুধু হয়ত আরও কয়েকটি বিনিদ্র রজনীরই কারণ হয়েছিল—কারণ হয়েছিল ললাটের রেখাগুলি গভীরতর হওয়ার।

শুধু হয়ত আর একটু বুড়োই ক'রে দিয়ে গিয়েছিল তাঁকে।

এছাড়া অন্তরের আকুল বিক্ষোভের কোন বহিঃপ্রকাশ কোথাও ঘটে নি।

এর চেয়ে গভীর আঘাতের কারণ হ'লেও সে বহিপ্র্কাশ ঘটত না। বুক ভেঙে গেলেও মুখ ফুটে তা বলতে পারতেন না কাউকে।

কিন্তু সে তো গেল তাঁর কথা।

মীরার কি হয়েছিল সেদিন ?

কেন সে অমিয়বাবুর না-বলা কথাগুলো শুনতে পায় নি, পড়তে পারে নি সেই অনুক্ত বাণী তাঁর নিরব ব্যথা-ভরা দুটি চোখে ?

যে মানুষের কাছে তার ঋণের শেষ নেই—যার কাছে সে এত কৃতজ্ঞ—তাঁকে কেন চেনে নি সে ? কেন তাঁর কাছে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে অপরিসীম ঋণের সামান্য মাত্র পরিশোধ করতে পারে নি ?

কেন নিজের যথার্থ বন্ধুর হাত ধরে নিজেকে ও তাঁকে সুখী করতে পারে নি ?

সে কি সত্যই এসব ভাবে নি ব'লে ?

সে কি সত্যিই অমিয়বাবুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারে নি ?

বুঝতে পারে নি কী প্রচণ্ড তুফান উঠেছে সেখানে ? কী মর্মান্তিক আঘাতে তাঁর বুকটা গুঁড়িয়ে পিষে যাচ্ছে ?

সে কি সত্যিই এত নির্বোধ—এত হৃদয়হীন—এত অকৃতজ্ঞ ?

কিন্তু তাকে যারা জানে তারা সে কথা বলবে না। সে নিজেও জানে যে সত্যিই সে এত অপদার্থ, এত বেইমান নয়।

তবে ?

সে দেখে নি দেখতে চায় নি বলে।

কিন্তু কেন—কেন সে দেখতে চায় নি, এই সহজ সত্যটা ?

কেন সে এমন ক'রে চোখ বুজে ছিল নিজেরই সুখের পথটার দিকে ?

নিজের ও আর একটি মানুষের সুখের পথ এমন নির্বোধের মতো বন্ধ ক'রে দিয়েছিল—দেবতার মতো একটি মানুষের ?

নিজের সার্থকতার পথে নিজেই এমন ক'রে কাঁটা দিয়েছিল !

কেন ! কেন !

এই মূঢ়তা ও অন্ধতার মূলে কি আর একটা মানুষ ছিল না ?

সহস্র দুঃখের কারণ, অপদার্থ, অমানুষ—সবই ঠিক।

কিন্তু এ-ও ঠিক—কিশোর বয়সে পরিপূর্ণ নির্ভরতায় তারই হাত ধরেছিল এক দিন।

ভালবেসেছিল যে শুধু তাই নয়—সবচেয়ে আপন মানুষ বলেই তাকে চিনেছিল।

সেই বোধটা ধীরে ধীরে কখন অভ্যাস ও অভ্যাস থেকে স্বভাবে পরিণত হয়েছে তা সে বুঝতে পারে নি।

সেদিনও মনের অবচেতনে সেই বোধটাই বোধ হয় তার মন জুড়ে ছিল, তাই কোন দিকে তাকাতে পারে নি—পারে নি নিজের সুখের প্রশস্ত পথটা বেছে নিতে।

কোথায় যেন বেধেছিল তার। অদৃশ্য একটা শক্তি বাধা দিয়েছিল।

অদৃশ্য কিন্তু অমোঘ সে শক্তি।

॥ ৮ ॥

অদৃষ্ট। জন্ম-লগ্নের লিখন। নইলে এমন হবে কেন ?

কৈ, কখনও কারুর মুখে তো সে এমন কাহিনী আর শোনে নি।

দেখে নি কারুর জীবনে এমন ঘটতে।

সুখী হবার ও সুখী করবার সহস্র উপকরণ ও উপায় থাকতেও এমন ব্যর্থ হ'তে তো আর কাউকে দেখে নি সে।

জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অভাবটা মিটেছে বটে—একদিন যে প্রশ্নটা সব চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা আজ আর সামনে নেই—কিন্তু—তবু এই কি জীবন ?

এই জীবন নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে ? দীর্ঘদিন কাটাতে পারে ?

এমনি গতানুগতিক, একঘেয়ে—বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন ?

যেদিন কাজ থাকে সেদিন তবু ভাল—যেদিন তা থাকে না, সেদিন এই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ ফ্ল্যাটে ফিরে বড়ই যেন খারাপ লাগে।

মনে হয়, জীবনে কিছুই হ'ল না তার—কিছুই সে পেলে না।

একটা যদি সন্তানও থাকত !

কিন্তু সে অভাবের চেয়েও—যা পায় নি কোন দিন, তার অভাব এতটা তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে না—যেটা সে পেয়েছিল, জীবনপথের সঙ্গী একজন, সুখ-দুঃখের অংশভাগী না হোক—তবু সঙ্গী—তার অভাবটাই যেন তাকে বেশী ক'রে পীড়া দেয়।

এটা আরও হয়েছে ইদানীং—বোধ হয় সহদেবের এই আকস্মিক খ্যাতিবৃদ্ধির জন্যই।

তার এই বাংলাজোড়া ভারতজোড়া খ্যাতিই বোধ হয় ওর অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ।

যাকে ভুলতে চায় সে, যাকে ভুলেই এসেছিল কতকটা, চারিদিক থেকে তার নামটাই আবার যদি সকলে কানের কাছে ঢাক পিটিয়ে উচ্চারণ করতে থাকে তো তাকে ভোলা যায় কী ক'রে ?

কাগজ খুললে তার নাম, পথে যেতে যেতে পোস্টার হোর্ডিং-এ তার নাম, ছাত্রীদের মুখে, সহকর্মিণীদের মুখে, ট্রামে-বাসে সহযাত্রী-যাত্রিণীদের মুখে—তার নাম শুনে শুনে সে বিরক্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন।

তার নাম বারে বারে নিত্য তার কানের পাশে উচ্চারিত হয়ে—তার চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বারবারই তাকে মনে করিয়ে দেয় যে সে কত হতভাগিনী, সে কত নিঃস্ব, কত নিঃসঙ্গ।

অথচ এই সহদেব তারই স্বামী—আজও পর্যন্ত।

তাদের বিবাহ-বন্ধন আইনত, ধর্মত আজও অটুট আছে।

সে কুলত্যাগ ক'রে আসে নি, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নি।

তার চরিত্রে কোন দোষ অতি বড় শত্রুও দিতে পারবে না।

অথচ স্বামী থাকতেও—নাম করবার মতো, গর্ব করবার মতো স্বামী থাকা সত্ত্বেও—সে আজ অনাথিনী অভাগিনীর মতো নিঃসঙ্গ একা এখানে পড়ে আছে।

নির্বান্ধব বিধবার মতোই দশা তার।

অথচ এই গৌরবের প্রধান অংশভাগিনী হবার কথা তারই।

চতুর্দিকে সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত এই স্তুতির অমৃত অঞ্জলি ভরে তারই পান করার কথা সর্বাগ্রে।

ঐ লোকটাকে ঘিরে যে জনতা, যে কোলাহল, সে কোলাহলের, সে কর্মব্যস্ত জীবনের নিরন্ধ্র নিরবসরে তারই হাঁপিয়ে ওঠবার কথা।

সেও ক্লান্তি, কিন্তু বড় মধুর ক্লান্তি সে। এ কর্মহীনতার ক্লান্তির থেকে সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয়।

এই কথাটাই সে ভুলতে পারে না যে! ভুলতে পারে না যে নিজেকে।

নিজের কথা এবং সহদেবের কথা চিন্তা করতে করতে বুঝি কৌতুহলও তার অদম্য হয়ে ওঠে।

সত্যিই কি কিছু শিখেছে লোকটা?

সেই ভবঘুরে বাউণ্ডুলে আত্মসম্মানহীন নির্লজ্জ লোকটা?

কখন শিখল? কেমন ক'রে শিখল? আট বছরের মধ্যে তো কোথাও গাইতে শোনে নি সে।

তবে?

এক এক সময় এমনও মনে হয়েছে যে, এ অন্য কোন সহদেব নয় তো?

সহদেব এবং চট্টোপাধ্যায় দুটোই অপর কোন লোকের সঙ্গে এমন দৈবাৎ মিলবে-এ বিশ্বাস হয় না।

বিশেষ ক'রে সহদেব নামটা বাংলা দেশে খুব সুলভ নয়।

সুতরাং এ যে সে-ই, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সে এত বড় গাইয়ে হয়েছে ? আশ্চর্য !

কৌতুহলও যেমন বোধ করে, তেমনি বোধ করে প্রচণ্ড একটা ক্ষোভ আর অভিমান। আকণ্ঠ ফেনিয়ে ওঠে একটা প্রবল চিত্তদাহ।

অদৃষ্টের এ কী নির্মম পরিহাস! যার গান শুনে গোটা দেশের লোক তৃপ্ত, গর্বিত—তার গান সর্বাগ্রে যার শোনবার কথা—সে-ই শুনল না আজও !

কিন্তু অপমান আর ক্ষোভের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী বুঝি কৌতূহল।

তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত অভিমান ও চিত্ত-বিক্ষোভ ছাপিয়ে ক্রমশ কৌতূহলেরই জয় হয়।

একটু একটু ক'রে সচেতন হয়ে ওঠে সহদেবের সংবাদ সম্বন্ধে।

কাগজে কোন জলসার বিজ্ঞাপন থাকলে আগে চোখ বুলিয়ে দেখে সহদেবের নাম আছে কি না! কত বড় হয়েছে সে! কত লোকে তাকে ডাকছে! কার কার নামের ওপরে তার নাম ছাপা হচ্ছে, কত ওপরে—আর কত বড় হরফে !

এই ভাবেই কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে আজ নজরে পড়ল এই সঙ্গীত-সম্মেলনটার বিজ্ঞাপন।

বড় বড় ক'রে নাম দিয়েছে সহদেবের।

গাইবে সে, আজই গাইবে।

মনটা যেন অকস্মাৎ দুলে ওঠে।

যাবে নাকি মীরা চুপিচুপি ?

শুনে আসবে ?

এক পাশ থেকে, সবার আড়ালে দাঁড়িয়ে ?

অপমান অবশ্যই—এমনভাবে অনাহূত রবাহূত হয়ে নিজের স্বামীর গান শুনতে যাওয়া !

কিন্তু কে আর চিনতে পারছে তাকে ?

জানতে পারলে চিনতে পারলেই না অপমান !

অনেকক্ষণ দ্বিধায় দোল খেল সে। তার পর একসময় মন স্থির ক'রে ফেলল।

যাবে সে, আজই যাবে।…

ইস্কুল থেকেই একফাঁকে ফোন করল! 'আজকের কোন টিকিট পাওয়া যাবে ?…' 'দুঃখিত, একখানা টিকিটও নেই। শুধু হাজার টাকার ডোনেশন দিলে হয়ত কোনমতে একটা ব্যবস্থা হতে পারে—' কথা শেষ হবার আগেই মীরা ফোন রেখে দিল।

যাক্, আপদ চুকেই গেল। দ্বিধা-সংশয়ের আর কোন প্রয়োজন রইল না।

যাওয়া যখন সম্ভবই নয় তখন যাওয়াটা উচিত কি অনুচিত সে প্রশ্নই ওঠে না।

নিশ্চিন্ত সে। নিজের কাছেই নিজে লজ্জা বোধ করার দারুণ লজ্জা থেকে সে মুক্ত।

স্কুলের কাজ সেরে বাড়ি এল একটু রাত ক'রেই।

ইচ্ছা ক'রেই অনেকক্ষণ অফিসে বসে কাজ করল।

বাড়ি ফিরে কোন লাভ নেই। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছাও করে না।

একা থাকতে আজকাল যেন ভয় করে তার।

কিছুকাল থেকেই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে নিঃসঙ্গতা।

একা থাকলেই ঘুরেফিরে ঐ লোকটার চিন্তাতে মনটা চলে যায়—সে-ই আরও অসহ্য।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইস্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি আসবার পথে কেন যে আজ সে ট্যাক্সি করল এবং সে ট্যাক্সিকে ঐ পথ দিয়ে, সম্মেলনের মণ্ডপের পাশ দিয়ে যেতে বলল, তা সে নিজেই জানে না।

ট্যাক্সিকে নির্দেশ দেবার পর চমক ভাঙল তার, অকারণেই বিব্রত বোধ করল খানিকটা—কিন্তু তখন আর ফেরা গেল না।

ফেরা সম্ভব হ'ল না। সে চেষ্টা করলে বড্ড বেশী নাটুকেপনা মনে হ'ত নিজেরই। আর ওখান দিয়ে এলেই বা এমন দোষ কি ? মনকে বোঝাল সে।

আসতে-আসতেই লক্ষ্য করল—মণ্ডপের বাইরেও বহু লোক জমেছে। তখন থেকেই জমতে শুরু করেছে।

চেয়ে দেখল দু দিকে দুটো লাউড স্পীকার বাঁধা সামনেই।

অর্থাৎ বাইরে থেকেও শোনবার ব্যবস্থা হয়েছে। টিকিট না কিনেও শোনা যেতে পারে !

সেই কথাটাই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

বাড়ি ফিরে এসেও একবিন্দু স্বস্তি পেল না সে।

কে যেন শুধুই তাড়না করতে লাগল তাকে।

এই তো ভাল। আরও ভাল। পয়সাও খরচ হবে না, পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও কম—বেশ বাইরে দাঁড়িয়ে গানটা শুনে চলে আসবে। মন্দ কি !

অনেকক্ষণ মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করল।

টানাটানি করল আবেগের সঙ্গে।

বোঝাতে চেষ্টা করল মনকে।

যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল যে এ খেয়াল ভাল না, এ বিপজ্জনক।

তার পর রাত সাড়ে দশটা বাজতে আর স্থির থাকতে পারল না।

জয় হ'ল আবেগের। জয় হ'ল কৌতূহলের। মানুষের অদৃষ্ট-দেবতা আড়ালে বসে মানুষের জীবন নিয়ে রসিকতার সাধ মেটান—জয় হ'ল তাঁরও।

কেউ টের পাবে না। কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না।

ঝি ঘুমিয়ে পড়েছে, সে জানতেও পারবে না।

ফ্ল্যাটের দরজায় তালা লাগিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল সে।

॥ ৯ ॥

ঝি যখন চা তৈরি ক'রে ওকে ডাকল, তখনই বলতে গেলে চোখে প্রথম তন্দ্রা নেমেছে মীরার।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখল, কটকট করছে রোদ বাইরে। বেশ বেলা হয়ে গেছে।

'তোমার শরীর খারাপ নাকি দিদি, মুখচোখের এমন হাল কেন? চোখ দুটো যেন করমচার মতো লাল।' উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল ঝি।

'না—ঘুম হয় নি রাত্রে ভাল, তাই।'

মীরা উঠে মুখ ধুতে গেল তাড়াতাড়ি।

চা খেয়ে খবরের কাগজখানা খুলে বসল সে প্রতিদিনের অভ্যাসমতো।

পুরুষের মতো কাজ করতে করতে পুরুষের মতোই কতকগুলো অভ্যাস হয়ে যায় মেয়েদের—ওরও হয়েছে।

প্রভাতের প্রথম চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ-পড়া এমনিই একটা অভ্যাস।

নিজেও সে কথা ভাবে মধ্যে মধ্যে মীরা।

আবার ভাবে মেয়েদের জীবন যখন ওর ভাগ্যে নেই, তখন সে জীবনের চিহ্ন ধরে রেখেই বা লাভ কি!

কিন্তু খবরের কাগজটা সামনেই খোলাই রইল শুধু, মনটা এই প্রসঙ্গে নিজের অতীতে চলে গেল।

অতি তিক্ত সে অতীত, অতি বেদনাদায়ক।

ভাবতে গেলে মনটা টনটন ক'রে ওঠে—তবু না ভেবেও পারে না।

মন তার ঘুরে ফিরে নিজের বিচিত্র ভাগ্য, বর্তমান রুটিন-বাঁধা নিরস জীবনযাত্রা, এই একান্ত নিঃসঙ্গতা, অতীত কালের ইতিহাস—যখন ভোর চারটেয় উঠে উনুনে আঁচ দিয়ে পরের জন্যে চা করতে করতে অর্ধেক দিন নিজের এক পেয়ালা জুটত না—সেই প্রসঙ্গে সহদেবের অত্যধিক চা-প্রীতি এবং তা থেকে সোজাসুজি এক সময় সহদেবেই এসে পৌঁছল।

এবং সেইখানেই থেমে গেল সে।

স্মৃতির রোমন্থন চলতে লাগল মনে মনে।

ও বুঝতেই পারল না ও কি করছে, বুঝতে পারলে হয়ত চটে উঠত নিজের উপরই।

অনেকক্ষণ পরে ঝি এসে বাজারের পয়সা চাইতে সে আবিষ্কার করল যে, দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে বসে নিবিষ্ট চিত্তে তার সেই ছেড়ে-আসা-স্বামীর কথাই ভাবছে সে।

আর তার ফলে আসল চা-টাই এখনও খাওয়া হয় নি তার!

ঝি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'ও কি দিদি, চা খাও নি? কেন, চা খারাপ হয়েছে নাকি?'

মীরা লজ্জিত হয়ে চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না না—এমনিই! ত্যাখ—কী সব ভাবছি বসে বসে! আসলে ঘুম হয় নি কিনা, শরীরটাই বিগড়েছে।'

'আর একটু চা ক'রে দেব নাকি?' ঝি জিজ্ঞাসা করে।

'না না—এখন থাক। তুমি ফিরে এস—তার পর না হয় দিও।'

ঝি বাজারের পয়সা নিয়ে চলে গেল, কিন্তু মীরাও আর স্থির হয়ে বসতে পারল না।

কাজ করতে হবে—কাজ ছাড়া এ দিবা-স্বপ্নর হাত থেকে অব্যাহতি নেই তার। কিন্তু কাজই কি করতে পারবে শেষ পর্যন্ত?

কতকগুলো জরুরী চিঠি ছিল—অন্যদিন সে এসব দরকারী চিঠির মুসাবিদা বাড়ি থেকেই ক'রে নিয়ে যায়—আজ তাতেও মন বসল না।

খবরের কাগজটার দিকে আর একবার জোর ক'রে তাকাল, কিন্তু বড় বড় হেডলাইনগুলো ছাড়া আর কিছুই পড়া হ'ল না। তাও তার পুরো অর্থ মাথায় ঢুকল কি না সন্দেহ।

সে বিরক্ত হয়ে উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

ভাল লাগল না।

সামনে শুধুই আগের ব্লকের অসংখ্য ফ্ল্যাট থেকে ত্রিশূলাকৃতি অগণিত নল পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নীচে নামার দৃশ্য। এদিকটা ওদের পিছন দিক, ভিতরের জালেঘেরা বারান্দা আছে একফালি ক'রে বটে—তবে তা দিয়েও অন্তঃপুরের বিভাগটাই দেখা যায় শুধু। সেটা, মধ্যবিত্ত পরিবারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, দেখবার মতো কিছু না। ভিজে কাপড়ে আর ভিজে কাঁথায়—কয়লার বাক্সে ও ঘুঁটের ঝুড়িতে কুশ্রী, নোংরা হয়ে থাকে। জঞ্জালের স্তূপ মনে হয়।

সেখান থেকে ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসল। একটু পরে আবার উঠল। অস্থিরভাবে পায়চারি করল খানিকটা।

এ কী হ'ল আজ তার ! না না—এমন হ'লে তো চলবে না। তাকে যে খেটে খেতে হবে। এসব স্বপ্ন দেখার তার সময় কৈ ?

কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না।

কেমন যেন ভয়-ভয় করছে তার। ভয় করছে নিজেকেই। তার মন যেদিকে তাকে ঠেলছে—অমোঘ ও অপ্রতিহত বলে—সেদিকেই তাকে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত, এটা অন্তরে অন্তরে অনুভব করছে সে।

আর সেইখানেই তার ভয়। মনের এই খেয়াল, এই দুর্বুদ্ধির সঙ্গে লড়াই করার শক্তি ক্রমশই যে কমে আসছে, সেটাও সে বুঝছে।

সেই সঙ্গেই বুকের মধ্যে একটা হিম হতাশা অনুভব করছে ; ভেতরে ভেতরে যেন কিসের একটা কম্পন। হাত-পাগুলোতেও বল নেই একটু।

নিজের রক্তেই নিজের সর্বনাশের আভাস পাচ্ছে সে, শুনতে পাচ্ছে ঝড়ের সংকেত।

ঝি ফিরল বাজার ক'রে।

ওর দরজা খোলার শব্দে সম্বিৎ ফিরল মীরার।

সঙ্গে সঙ্গে মনও স্থির ক'রে ফেলল।

সামান্যতম প্রসাধন ক'রে, শাড়িটা পাল্‌টে তখনই বেরিয়ে পড়ল সে।

ঝি পেছন থেকে হেঁকে জিজ্ঞাসা করলে, 'দিদি, এমন সময় বেরোচ্ছ যে, আজ ইস্কুল নেই ?'

'না গো পরীর মা, আজ ছুটি।'

ছুটিটা সত্যিই—যদিও সে কথাটা এই এখনই, এইমাত্র, মনে পড়ল।

সঙ্গীত-সম্মেলনের মণ্ডপ তখন খালি। জনাকতক জমাদার ভেতরটা ঝাড়ু দিচ্ছে শুধু। গতরাত্রের বিপুল জনতা তাদের নোংরা স্বভাবের চিহ্ন রেখে গেছে সর্বত্র। সে চিহ্ন মুছতে বিস্তর সময় লাগবে ওদের। রাস্তাতেও আবর্জনার স্তূপ ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সেটা আরও সকালে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

এ সময় উদ্যোক্তাদের কাউকে পাবার কথা নয়।

সে আশাও করে নি মীরা—না এসে পারে নি বলেই এসেছে।

বরং মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছে যে, কারুর দেখা না পেয়ে মণ্ডপ থেকে তো ফিরতেই হবে, আর তা হ'লেই শান্ত হবে তার এই আবেগ, নিরস্ত হবে এই কাঙালপনা থেকে।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে দেখল গেটের কাছে একটা বেঞ্চিতে তিন-চারটি তরুণ বসে আড্ডা দিচ্ছে।

তাদের বেশভূষার পারিপাট্যে মনে হ'ল এরা কর্তাব্যক্তিদের কেউ না হ'লেও নিতান্ত 'পাড়ার চ্যাংড়া অনুগ্রহপ্রার্থী' নয়। উদ্যোক্তাদের ভারপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীর কেউ হবে।

তাদেরই একজনকে গিয়ে ধরল মীরা।

'আচ্ছা···ঐ যে গাইয়ে মিঃ চ্যাটার্জী—স-সহদেববাবুর বর্তমান ঠিকানাটা একটু দিতে পারেন আমাকে? ওঁর বাড়িটা কোথায় জানতে চাইছি?'

মীরার চেহারায় না হোক, বেশভূষা ও কথা বলার ভঙ্গীতে কোথায় একটা আভিজাত্য ছিল, ছেলেগুলি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

এ রকম খোঁজ ওদের কাছে অজস্র আসে, নিত্যই। ভক্তদের উৎপাত থেকে দেবতাদের রক্ষা করতে জানে ওরা। কিন্তু এক্ষেত্রে, যেন কেমন ক'রে বুঝতে পারল ওরা যে, এ মহিলা হুজুগের বাতাসে উড়ে বেড়ানো কোন আধুনিকা নন। সে ধরণের প্রয়োজনও নয় এঁর।

'সহদেববাবু? আই মীন সহদেব চ্যাটার্জীর ঠিকানা খুঁজছেন? মুশকিলে ফেললেন। উনি যে কোথায় কবে থাকেন তারই যে ঠিক নেই। বাড়ি বলতে ওঁর বিশেষ কিছু আছে বলেই তো জানি না আমরা।'

'তবু ঠিকানা একটা নিশ্চয় আছে—নইলে আপনারা যোগাযোগ করেন কী ক'রে? কোথাও তো মধ্যে মধ্যে বিশ্রামেরও দরকার হয়! যন্ত্রপাতি রাখা—রেওয়াজ করা, এগুলোও তো লাগে!'

প্রচ্ছন্ন একটু বিদ্রূপ মীরার কণ্ঠে।

এ বিদ্রূপের পিছনে যে জ্বালা আছে তা প্রকাশ করার স্থান এটা নয়, পাত্রও এরা নয়—তবু নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি প্রকাশ পায় সেই তিক্ততা।

ছেলেটির—ছেলেটি কেন, ছেলেগুলিরই—কৌতূহল হ'ল এবার। সবাই আপাদ-মস্তক দেখতে লাগল ওকে। একটু অপ্রতিভও হয়ে পড়ল বোধ হয়। শেষে একটি ছেলে উত্তর দিল, 'দেখুন, ওঁর বাসা বা বাড়ি বলতে সত্যিই কিছু নেই। আছে কতকগুলো ঘাঁটি। ভক্তের তো অভাব নেই—প্রত্যেক দিন, মানে যেদিন গান থাকে অবশ্য, দেখবেন চার-পাঁচখানা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকে ওঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেদিন যার ওপর ফ্যান্সি হয়—তার বাড়ি যান। নাটোরের বড় তরফ, কাসিমবাজারের ছোট তরফ, গৌরীপুর, দীঘাপতিয়া এঁদের বাড়ি তো

অবারিত দ্বার, এছাড়া শ্রীবাস্তব, চামারিয়া এঁরাও আছেন। লালগোলার দিকে ঝোঁকটাই বেশী অবশ্য। কারণ ওঁর বাড়ি বেশ নিরিবিলি। কোথাও দু দিন, কোথাও চার দিন, কোথাও বা এক মাস, এমনি ক'রেই থাকেন। এই ধরুন না—'

অসহিষ্ণু মীরা বাধা দিয়ে বলল, 'তা হ'লে মোটামুটি এঁদের বাড়িগুলো খোঁজ করলে কোথাও-না-কোথাও পেয়ে যাব—কী বলেন ?'

'হ্যাঁ। মনে তো হয়। তবে, দেখা পাবেন কি না সন্দেহ। হামেশাই লোক গিয়ে বিরক্ত করে বলে সাধারণত চেনা লোক না হ'লে বলে দেয়—এ বাড়িতে নেই, কী, ছিল বেরিয়ে গেছে, কিংবা অসুখ করেছে। এই রকমই শেখানো থাকে। তা আপনার কি ধরনের দরকার—'

কৌতূহল-কুটিল হয়ে ওঠে তার ভ্রূ।

'সে দরকার নিতান্তই ব্যক্তিগত' এই বলে একটু হেসে, নমস্কার ক'রে চলে আসে মীরা।

একটু দূরে এসে পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল মীরা। অনেকক্ষণ বসে রইল সেখানে।

সেই ভবঘুরে বাউণ্ডুলে স্বভাব।

এতটুকু পরিবর্তন হয় নি।

বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কও একেবারে ছেড়েছে।

ছন্নছাড়া বেহিসাবী জীবন—দু হাতে উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে নিজের পরমায়ু ও প্রতিভা।

ভবিষ্যতের কোন সঞ্চয় কোথাও রাখছে না। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটা ফেলার জন্য মানুষের একটু নীড় দরকার হয়—সে কথাটাও বোধ হয় একবার ভাবে নি কোন দিন!

এত ঐশ্বর্য, এত বিপুল সম্ভাবনা! সুখী হবার এত উপকরণ—কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই একটুও।

আজকের, এই মুহূর্তের বেঁচে থাকাটাই বুঝি ওর জীবনে চরম সত্য।

সেদিনও ছিল, আজও তাই।

কিন্তু সেদিন তার কিছু ছিল না, হারাবারও তাই ভয় ছিল না কিছু। আজ, আজ তো অনেক কিছু পেয়েছে সে, তবে আজও কেন সে এমন উদাসীন?

সত্যিই কি জীবনের বাস্তব দিকটা চোখ মেলে দেখার ক্ষমতা নেই ওর?

নির্বোধ, জীবন-অনভিজ্ঞ, আধপাগল!

কিম্বা এই আপাত-উদাসীনতার আড়ালে আছে কোন প্রচ্ছন্ন অভিমানবোধ, আছে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার একটা বেপরোয়া চেষ্টা!

কে জানে তারই দোষ কি না!

সে যদি ছেড়ে না আসত, তা হ'লে হয়ত এতটা হ'ত না।

হয়ত জীবনের ওপর মমত্ববোধ জন্মাত একটা। সাংসারিক জ্ঞান হ'ত কিছু।

হয়ত—এত দিনে তারা নিজেদের গৃহস্থালী সাজিয়ে বসতে পারত।

সমারোহে না হোক—সসম্মানে।

জীবন অন্য খাতে বইত তাদের। জীবনই জীবন সম্বন্ধে মমত্ববোধ আনে, সুখ জাগায় সুখের পিপাসা।

হয়ত—

না না। তার দোষ সে মানবে না কিছুতেই। যথেষ্ট করেছে সে, সাধ্যের অতিরিক্ত করেছে। এর বেশী অন্য কোন মেয়েরও সইত না।

হয়ত এতটাও সহ্য করত না কেউ।

তাছাড়া ও যাকে অভিমান ভাবছে সে হয়ত ওর উদাসীনতাই। এর চেয়ে বেশী ক'রে বোঝবার ভাববার ক্ষমতাই নেই ওর। কোন দিন ছিলও না।

কিন্তু সে কথা থাক। এখন কি করবে সে?

এইখানেই এ প্রসঙ্গ শেষ ক'রে নিশ্চিন্ত হওয়াই উচিত ওর। উচিত সেই লোকটাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া।

কিন্তু কেমন ক'রে যেন নিজের মনে মনে বুঝতে পারে মীরা যে উচিত জেনেও তা সে পারবে না।

কে যেন—হয়ত তার ভাগ্যই তাকে আজ অপ্রতিহতবলে টানছে—নূতনতর এক আঘাতের দিকে, তীব্রতর এক অপমানের দিকে।

তা হ'লে, কী করবে সে?

যাবে?

যদি দেখা না করে? যদি চিনতে না পারে? যদি চিনতে পেরেও অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেয়?

না না—তা হ'লে আত্মহত্যা করা ছাড়া এ মুখ ঢাকবার আর কোন পথ থাকবে না!

ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

যাকে ত্যাগ ক'রে চলে এসেছে একদা—অবজ্ঞায় ঘৃণায়—তার দোরে গিয়ে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে চলে আসা!

এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হ'তে পারে না। এর চেয়ে বড় আঘাত কল্পনা করাই যায় না।

আর কেন? কেনই বা যাবে সে, কিসের জন্যে সেই অমানুষটার দ্বারে ভিক্ষুক হয়ে গিয়ে দাঁড়াবে!

হ'তে পারে আজ সে বড় গাইয়ে হয়েছে, বড় শিল্পী। কিন্তু তাতে আসল মানুষটার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করে না মীরা। কারণ তা হয় না—হওয়া সম্ভব নয়।

পেতলের ডেলাটা ঘটি-ঘড়া হলে কাজে লাগে ঠিকই, কিন্তু তার দাম বাড়ে না। একটা বৃত্তি শিখে পয়সা রোজগার করতে পারে লোকে অনায়াসে—কিন্তু

তাতে স্বভাব পাল্‌টায় না।

আর আজ, মীরার কাছে অন্তত, বড় শিল্পীর চেয়ে মহৎ মানুষের মূল্য অনেক বেশি। সে মানুষ—কোনদিনই হ'তে পারবে না ঐ লোকটা, তা মীরা জানে।

তবু, ঐ অপদার্থ লোকটার কাছেই যাবে—যেচে, সেধে?

না—না। তা সে যাবে না। ওর দোরে গিয়ে দাঁড়াবে না সে কখনই।

এ কথা তার মাথাতে গেলই বা কী ক'রে।...ছি! গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়া, আগু বেড়ে অপমানিত হ'তে যাওয়া! সে অপমান যে মৃত্যুরও অধিক।

সুদীর্ঘ আট-আটটা বছর ধরে অনেক অপমান সয়েছে সে।

অমানুষের সঙ্গে ঘর করাই তো অপমান। নিত্য চরম অপমান।

সে অপমান অতদিন সহ্য করেছিল সে কী ক'রে এই তো আশ্চর্য!

এ বিষয়ে কোন বোধই ছিল না বলে বোধ হয় পেরেছিল সে। জন্তুর মতো, জড় বস্তুপিণ্ডের মতো সয়ে গেছে সে—ঐ অমানুষটার অবহেলা এবং বাড়িসুদ্ধ লোকের লাঞ্ছনা।

সবচেয়ে—পিছন দিকে তাকালে যেটা ওর কাছে এখন সকলের চেয়ে বিস্ময়কর লাগে—ঐ মানুষটার জন্য কী না করেছে সে, বলতে গেলে সংসারের সকল আঘাত থেকে আগলে রেখেছিল সে নিজের পক্ষপুটে—সে আঘাত নিজের ওপর নিয়ে ওকে আড়াল ক'রে রেখেছিল—অথচ তার বদলে কী নিদারুণ অবহেলাই না পেয়েছে সে! কৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, সে সত্যটার দিকেও তাকায় নি পর্যন্ত।

এতটা অবিচারও তো সয়েছিল সে!

আজ সেদিনের কথা মনে হ'লে সর্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব করে একটা। নিদারুণ বিষদাহ। প্রবল আত্মধিক্কারে গলা পর্যন্ত যেন তিক্ততা ফেনিয়ে ওঠে।

এতটা যদি সে যে কোন মানুষের জন্য করত—ওর স্বামী ছাড়া যে কোন মানুষ—কুলী মজুর, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত যে কেউ—তা হ'লে সে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকত!

আসলে মানুষই যে নয় ও।

মনুষ্যত্বের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই ওর মধ্যে!

আজ মানুষ সে দেখেছে, চিনেছে। মানুষের মতো মানুষ।

শিক্ষিত, মার্জিত মানুষ কেমন হয় তা সে অনুভব করেছে।

অমিয়বাবুকে দেখেছে, তাঁর সাহায্য পেয়েছে।

কী পেতে পারত সে জীবনে তা ঐ লোকটির অতলস্পর্শ চোখের দিকে চেয়েই

বুঝতে পেরেছে ; যা চেয়েছিল সে স্বামীর কাছ থেকে—কী চাইছে তা না জেনে বা না বুঝেই। মনের মধ্যে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না তার, কিন্তু হাহাকার ছিল।

অমিয়বাবুকে দেখে সে বুঝতে পেরেছে কী চেয়েছিল সে—বুঝতে পেরেছে পৃথিবীর তাবৎ নারী কি চায়।

কী সুগভীর সহানুভূতি, কী ঐকান্তিক স্নেহই না উপ্‌চে পড়ে সেই শান্ত স্থির মানুষটির দুই চোখ দিয়ে।

কী অতন্দ্র সচেতনতা তাঁর—ওর ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে।

মনে হয় তাঁর মনের একটা দিক—একটা চোখ এবং একটা কান সর্বদাই সজাগ সতর্ক থাকে ওর সম্বন্ধে।

তিনিও আজ প্রৌঢ় কিন্তু মীরাও তো বলতে গেলে বিগত-যৌবনা। তিনি প্রৌঢ় হলেও তাঁর যা প্রতিষ্ঠা, তাঁর যা অর্থ—যে-কোন তরুণী নারীই তাঁকে আত্মদান করতে পারত। কিন্তু তিনি হয়ত আজও বসে আছেন, ওর জন্য। অপেক্ষা করছেন ওর অনুগ্রহের। ওর সচেতনতার। নিঃসঙ্গ প্রহরের মুহূর্ত গণনা করছেন ওরই প্রসন্ন দৃষ্টির প্রত্যাশায়।

মীরা জানে—আজও ওকে পেলে ধন্য, চরিতার্থ হয়ে যাবেন তিনি।

আর মীরাও—

মীরাও কি কৃতার্থ হবে না ?

নিশ্চয়ই হবে। মীরাও তা জানে, মনের মধ্যে এ সত্যটা সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না।

তৃষ্ণার্ত বঞ্চিত হৃদয় তার শান্ত হবে, তৃপ্ত হবে।

সারা জীবনের সমস্ত বঞ্চনার মূল্য শোধ হয়ে যাবে স্বল্প কয়েকটি মুহূর্তে।

তাই যাবে নাকি মীরা ?

আজও হয়ত সময় আছে।

এখন আইনেও আটকায় না। যে কোন মুহূর্তে সে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে।

তার পর হয়ত ছ'টি মাস অপেক্ষা করতে হবে।

তার পরই আনন্দ, তৃপ্তি ও সৌভাগ্য।

এ চাকরিও তাকে করতে হবে না।

কিছুই না। শান্ত, নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন লাভ করবে সে।

শুধু ওরই একটি সম্মতির অপেক্ষা।

কোন অভাবই থাকবে না।

অমিয়বাবুর যা কিছু আছে, তিনি আজ এমনিও ওকে নিবেদন ক'রে দিতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যাবেন তা সে জানে। আর তা খুব সামান্যও নয়।

এখনই যথাসর্বস্ব উজাড় ক'রে দিতেন হয়ত—যদি না মীরার আত্মসম্মানে আঘাত লাগার আশঙ্কা থাকত তাঁর মনে।

পুজো বা অন্য সময়ে কোন উপহার দিতে হ'লে কী সঙ্কোচের সঙ্গে, কী ভয়ে ভয়েই না দেন—যাতে দয়ার বা করুণার কথা একবারও না মনে দেখা দেয় মীরার।

এমন কি ওঁর অন্তরের অন্তরম প্রদেশের কথাটিও কখনও প্রকাশ পায় না সে উপহারের সঙ্গে।

তখন—যখন হাত পেতে আর্থিক সাহায্যই নিতে হয়েছে, তখনও সে অর্থ তিনি এমন ভাবেই দিয়েছেন ওকে, যাতে বাইরের লোকের চোখে মনে হয় মীরা তা গ্রহণ ক'রে তাঁকে চরিতার্থ করছে।

আর সে সাহায্যও তিনি করেছেন নিজে থেকে—সময় ও প্রয়োজন বুঝে—না চাইতেই।

অর্থাৎ মীরা তাঁর ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সকল চিন্তার মধ্যে সে-ই অগ্রগণ্য।...

তাই যাবে নাকি? তাঁর কাছেই গিয়ে পড়বে নাকি শেষ পর্যন্ত?

ঐ মানুষটিরই ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধিরূপে? ওঁর ঐ বিশাল হৃদয়ের বিপুল শূন্যতা সার্থকতায় পূর্ণ ক'রে দিতে?

বহুদিনের বহু তৃষ্ণা তাঁর প্রেমের মাধুর্য দিয়ে মেটাতে?

এখনও হয়ত সময় চলে যায় নি একেবারে।

এখনও হয়ত সুখী হ'তে পারে সে, সুখী করতে পারে।

তার সুখ তো তুচ্ছ, হয়ত আর তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই—কিন্তু যদি পারে ঐ মানুষটাকে একটুও সুখী করতে—ঐ দেবতার মতো মানুষটাকে—সেইটিই তো চরম ও পরম লাভ! অমন মানুষের তৃপ্তির জন্য, পরিপূর্ণতার জন্য আত্মদান করতে পারাটাও যে সৌভাগ্যের কথা।

নিজে থেকে গিয়ে বলবে, 'আমি এলাম তোমার কাছে—নিজেকে সঁপে দিতে! তোমার অন্তরের ক্ষুধা আমার অন্তর দিয়ে পূর্ণ করতে?'

দোষ কি?

তিনি বলতে পারেন নি—তাঁর ভদ্রতায়, সৌজন্যে, সংস্কৃতিতে বেধেছিল ব'লে।

নইলে তিনিই বলতেন।

লাজুক মুখচোরা বলেই—যেটা বলবার জন্য বুক ফেটে গেছে—সেটা বলতে পারেন নি।

সেকালের মেয়েদের মত বুকই ফেটেছে—মুখ ফোটে নি।

কিন্তু তিনি মানুষ, তাঁর দ্বারে ভিক্ষার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে কোন দোষ নেই।

॥ ১১ ॥

রোদটা মুখের ওপর এসে পড়েছে। একটু সরে বসল মীরা। এবার উঠতে হবে। নিঃসঙ্গ মধ্যবয়সী নারীকে অমন ভাবে বসে থাকতে দেখে জনবিরল পার্কেও দু'একটি দৃষ্টি কৌতূহলী হয়ে উঠছে।

উঠবে—কিন্তু কোথায়? কোথায় যাবে সে?

অমিয়বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দোষ নেই—তা সে জানে। তবু সেটা সে এতকাল পারে নি কেন?

সেই মৌলিক প্রশ্নটা যে থেকেই যাচ্ছে।

সে কি অমিয়বাবুর মনের দিকটা দেখতে পায় নি বলে?

না। দেখতে পায় নি নয়—দেখে নি। আর তা দেখে নি—দেখতে চায় নি বলেই।

কষ্ট হয়েছে অমিয়বাবুর জন্য, তাঁর দুঃখ নিজের দুঃখ দিয়েই অনুভব করেছে, তবু নিজে থেকে একটুও এগিয়ে যেতে পারে নি—পারে নি সামান্য মাত্রও প্রশ্রয় দিতে।

আজ আর আত্মপ্রতারণা ক'রে লাভ নেই। মন তার কম্পাসের কাঁটার মতো একদিকে হেলে ছিল বলেই আর কোন দিকে তাকায় নি। কাউকে দেখতে পায় নি।

হয়ত—হয়ত শুধু অমিয়বাবু নয়—আরও কেউ কেউ সেদিন পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছিল।

মীরা ঠিক রূপসী নয়—কিন্তু তার চেহারাতে যে একটা লাবণ্য আছে তা বহু লোকের কাছ থেকেই শুনেছে সে।

আয়নাতেও দেখেছে।

সে লাবণ্যকেও আরও আকর্ষক ক'রে তুলেছে তার স্বভাব-মাধুর্য। সে বিষয়েও অনবহিত নয় মীরা।

সুতরাং সেদিন সে ইচ্ছা করলে আরও বহুলোককে পেতে পারত। বেশ ধীরে-সুস্থে, মনের মতো লোক, কাম্য সঙ্গী বেছে নিতে পারত সে।

অমিয়বাবুর মত দেবতা সুলভ নয়—কিন্তু মানুষ আরও দু'চারজন এসেছিল তার সামনে।

আর তারাও ওকে পেলে কৃতার্থ হ'ত সেদিন।

কিন্তু তার সে প্রবৃত্তিই হয় নি। কোন এক দুর্জ্ঞেয় কারণে ঐ অমানুষ, ঐ ভবঘুরে বাউণ্ডুলে, ঘরছাড়া সংসারছাড়া, আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন লোকটাকে কিছুতেই ভুলতে পারে নি সে।

বলতে গেলে যাকে স্বেচ্ছায় ছেঁড়া জুতোর মতো ত্যাগ ক'রে এসেছে—তারই জন্য মনটা হাহাকার করেছে চিরকাল।

ভেতরে ভেতরে গুম্‌রে মরেছে সে হাহাকার—চক্ষুলজ্জা আর জীবনের রূঢ় বাস্তব সত্যের দেওয়ালে মাথা কুটে মরেছে।

অথচ কেন—তা সে নিজেই জানে না। কোন কারণই তো নেই।

দীর্ঘকাল তো সে স্বীকারই করে নি—অবচেতন মনের এই আচরণটাকে।

নিজের কাছেও স্বীকার করতে পারে নি সহজ সত্যটা।

সে বিষয়ে সামান্যতম সচেতন হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই জোর ক'রে দাবিয়ে রেখেছে সেই সচেতনতাকে। না—না—না, এমন হয় না, এমন সে হ'তে দেবে না।

কেন সে লোকটার জন্য হাহাকার করবে সে? কী পেয়েছে তার কাছ থেকে? কী আশা রাখে সে আজও?

না, তাকে সে চায় না—চাইবে না কোন দিন। পেছন ফিরে তাকাবে না। যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত নয় সে এতটুকুও। কোন অপরাধ করে নি—তাই তার প্রায়শ্চিত্ত করারও কোন প্রশ্ন ওঠে না।

যা করেছে ঠিকই করেছে সে।…

তবু একসময় হার মানতে হয়েছে।

এক সময় স্বীকার করতে হয়েছে যে যা হয় না, যা হওয়া উচিত নয়—তা-ই তার জীবনে হয়েছে। এমন অঘটনই ঘটেছে।

কে জানে, হয়ত একেবারে কিশোর বয়সেই লোকটার হাত ধরেছিল বলে, হয়ত বা বিবাহের পর প্রথম একটি বছর ওদের দাম্পত্য-জীবন সুধায় পূর্ণ হয়ে ছিল বলে —কিম্বা—ঐ লোকটা শিশুর মতো অসহায় সংসারানভিজ্ঞ বলেই—আজও তাকে সে ভুলতে পারে নি। মনের কোন্ গোপন গহনে আজও তার জন্য হাহাকার জাগে; আজও ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয় তার চিত্ত।

কে জানে, হয়ত বা তার নিঃসন্তান জীবনের মাতৃহৃদয় ঐ অমানুষটাকেই তার সমস্ত স্নেহ, সমস্ত প্রশ্রয় ঢেলে দিয়ে পূর্ণ হ'তে চেয়েছিল। সত্যি-সত্যিই ভাল-

বেসেছিল ওকে !

সে ভালবাসা আজও যায় নি একেবারে। আজও তার শুষ্ক তৃষার্ত হৃদয় একান্ত ভাবে তাকেই চায়। চায় তাকেই ফিরে পেতে।

অথবা অপমানিত উপক্রুত নারীহৃদয় চায় ঐ উদাসীন নির্মম মনটাকে বিজয়িনীর পায়ের কাছে টেনে এনে এতদিনের অবহেলার চরম প্রতিশোধ নিতে।

রোদটা আবারও সরে এসে মুখে লাগে।

নাঃ, উঠে পড়তেই হবে এবার। এভাবে বসে থাকা আর সম্ভব নয়।

কোথাও আর একটিও বেঞ্চি এমন নেই—যেখানে একটু ছায়া, একটু শান্তি মিলতে পারে।

কী করবে মীরা ? ঘরেই ফিরবে ? যেমন এসেছিল তেমনি ?

নিঃশব্দে এই অপমানটা গোপন ক'রে ? কেউ জানবার আগে, সর্বজনীন উপহাসের পাত্রী হবার আগে ? ভুল ক'রে এসেছিল সে—ভুল ভাঙতে চলে যাবে ! কেউ জানবে না, কাউকে জানাবারও দরকারও হবে না।

সেই তো ভাল। সেই তো শ্রেয়।

কারণ আর কেন ? বৃথা—বৃথা এই অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করা !...

যা ভেঙেছে তা আর জোড়া লাগবে না। যা স্বেচ্ছায় ফেলে এসেছে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। ফিরিয়ে নিলেও তা কাজে লাগবে না।

তার চেয়ে এ নাটক এখানেই শেষ ক'রে দেওয়া ভাল। ...

উঠে দাঁড়াল সে।

কিন্তু পা-দুটো অবাধ্য হয়ে ওঠে তার। বড়ই ভারী মনে হয় যেন। মনের নিভৃত ইচ্ছা বুঝেই সে দুটো বুঝি কিছুতেই আর চলতে চায় না।

আসলে—অস্বীকার ক'রে লাভ নেই—অন্তত আর এক বার নিভৃতে ঐ লোকটার সামনাসামনি দাঁড়াতে চায় সে। দেখতে চায় একবার।

পাঁচ জনের সামনে নয়—শুধু সে আর মীরা।

একবার শেষ চেষ্টা না ক'রে হাল ছাড়বে না সে—ছাড়তে পারবে না।

একটা চরম বোঝাপড়া করবে সে।

স্বামীর সঙ্গে ?

না, নিজের ভাগ্যের সঙ্গেই।

একবার দেখবে আজও তার তেমনি চরম ঔদাসীন্য আছে কিনা !

বুঝতে চেষ্টা করবে—ওর সেই ছেড়ে-আসার দিনটিতে এতটুকু ব্যথা জেগেছিল কিনা তার পাথরের মতো অসাড় মনটাতে!

তা বলে নিজে থেকে যেতেও পারবে না। ঐ ওদের বাড়িতে ওদের চোখের সামনে নিজের স্বামীর কাছে গিয়ে ভিক্ষুক হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

তার চেয়ে টেলিফোন করাই ভাল।

কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছিল মীরার।

অন্তরের তীব্র যুদ্ধে সে ক্লান্ত—অবসন্ন। এ চোখের জল বোধ হয় তারই ফল।

পরাজয়ের স্বীকৃতি, ক্লান্তির স্বীকৃতি।

তাড়াতাড়ি যেন নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করল মীরা, চশমা খুলে চোখ দুটো মুছে নিল ভাল ক'রে। তার পর চলল নিজের ইস্কুলে। ছুটির দিন বটে, কিন্তু দারোয়ান আছে। নিজের নির্জন অফিস-ঘর থেকে টেলিফোন করাই সুবিধা।

প্রথম দুটো জায়গাতেই নিরাশ হ'তে হ'ল।

না, সহদেববাবু এখানে নেই। কোথায় আছেন? তা তাঁরা জানেন না। তাছাড়া তাঁর ঠিকানা দেওয়া বারণও আছে।

কিন্তু দ্বিতীয় যিনি ওপারে ফোন ধরেছিলেন, তিনি বোধ করি মহিলার কণ্ঠস্বর শুনেই একটু সদয় হলেন।

তিনি একটা নম্বর দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো একবার এইটে রিং ক'রে, পান কি না। যতদূর মনে হ'ল এঁদের গাড়িতেই চাপল আজ ভোরে।'

সত্যিই সেইখানে পাওয়া গেল।

ওপার থেকে উত্তর এল, 'হ্যাঁ আছেন। কিন্তু একটু বিশ্রাম করছেন।'

'কখন পাব বলতে পারেন—মানে, ঘুম থেকে উঠবেন?'

'তা তো বলা মুশকিল।'

নিরস, নিরুৎসুক কণ্ঠ। বোধ হয় একটু বিরক্তও।

মীরা চকিতে একবার ঘড়িটা দেখে নিল।

এগারোটা বেজে গেছে। এখনও ঘুমুচ্ছে? এত বেলা অবধি ঘুমোনো তো কখনও অভ্যাস ছিল না। এ কী বদ্‌ অভ্যাস সব হয়েছে আজকাল!

মনে মনে যেন নিঃশব্দে অনুযোগ করে সে।

ভ্রূ কুঁচকে ওঠে একবার নিজের অজ্ঞাতসারেই।

তারপরই বলে, 'দেখুন, আমি—আমি একটা খুব জরুরী প্রয়োজনে ডাকছি।'

'কী প্রয়োজন জানতে পারি কি?'

খুব বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন —যিনি ফোন ধরেছিলেন—ওপার থেকে।

কিন্তু সেই সঙ্গে যেন এ-ও বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁরা যদি জরুরী প্রয়োজন বলে বিবেচনা না করেন তো কোন সুবিধা হবে না।

'আমি—আমি ওঁর বাড়ি থেকে ডাকছি।'

'ওঁর বাড়ি!'

বেশ একটু অবিশ্বাসের সুর বিস্ময়ের সঙ্গে।

'হ্যাঁ—বাড়ি।' মীরা যেন অকারণেই তেতে ওঠে, 'আমি—আমি ওঁর স্ত্রী বলছি!'

'ওঁর স্ত্রী! কৈ—কখনও তো—'

'শোনেন নি, এই তো? অনেক জিনিসই অনেক মানুষের শোনা থাকে না। আপনি দয়া ক'রে গিয়ে তাঁকে বলুন, তাঁর স্ত্রী মীরা তাঁকে ডাকছে।'

কথাগুলো বেরিয়ে গেল যেন কতকটা অজ্ঞাতসারে—ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।

বলার ইচ্ছা ছিল না, বলার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়ে উঠল সে—কিন্তু তবু ঐ এক মুহূর্তের সামান্যতম বিজয়গর্ব অনুভব করার লোভ সামলাতে পারল না।

থাকতে পারল না কথাগুলো না বলে।

ওপারে একটা বিস্ময়-সূচক আওয়াজ, রিসিভার রাখার একটা ধাতব শব্দ—তার পর মিনিট-দুই নীরবতা। কিন্তু ঘরে কারা ফিস্‌ফিস্ ক'রে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা কইছে সেটা এখান থেকেই বোঝা যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে—যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছে মীরা—লজ্জায় মরে যাচ্ছে নিজের ধৃষ্টতার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ভেবে—যেচে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাবার জন্য যখন নিজেকে 'নির্বোধ' বলে, 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' বলে গালাগালি দিচ্ছে সে—ঠিক সেই সময় ওপার থেকে শব্দ ভেসে এল, 'হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো! এ সব কী শুনছি, সত্যিই তুমি নাকি! নাকি কারও ছলনা?'

এর আগে—বিয়ের প্রথম বছর দু-একবার মাত্র ওদের টেলিফোনে কথা কইবার সুযোগ হয়েছে—তবু মনে হ'ল কণ্ঠস্বরটা চেনা যায়।

তা ছাড়া কাল যে লোকটা গান গাইছিল সেই রকমই বটে গলাটা।

হঠাৎ হাতটা এমন কাঁপছে কেন? রিসিভারটা যেন কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছে না!

কপালে এত ঘামই বা কোথা থেকে এল ? বুকের মধ্যে এ কিসের শব্দ এত ?

গলাতে আওয়াজও যে বেরোতে চায় না !

কী মুশকিল !

মাত্র ক্ষণকাল পূর্বের সে দার্ঢ্য কোথায় গেল মীরার ?

অতিকষ্টে বললে, 'হ্যাঁ, আমিই বলছি, আমি মীরা ।'

'বল বল, ব্যাপার কি ?···কী সৌভাগ্য আমার !···বাপ্‌ রে, আশাই করি নি কখনও যে তুমি আমার খোঁজ করবে। এখনও যেন বিশ্বাস হ'তে চাইছে না কথাটা ।···তার পর ? কোথায় আছ আজকাল ? কী করছ ?'

সহজ অন্তরঙ্গতা তার কণ্ঠে ।

'মাস্টারী করছি ।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুনেছি বটে। মধ্যে রণ্টু, মানে তোমার ভাইপো একদিন দেখা করেছিল, তার মুখেই শুনেছি ।···তা এখন ফোন করছ কোথা থেকে ?'

'ইস্কুল থেকেই। পার্ক সার্কাসের কাছে ।'

'আরে, তা হ'লে তো এখানেই। চলে এস না। এই তো মার্লিন পার্ক। রাজাবাহাদুরের বাড়ি···খুবই কাছে ।···ও, কতকাল দেখা হয় নি বল তো ! চলে এস। চলে এস ।···গাড়ি পাঠাব ?'

'না। এতকাল পরে অপরিচিত লোকের সামনে তোমার সঙ্গে দেখা করব না !···তুমি—তুমি একবার আসতে পার না ?—আমার বাসায় ?'

'তোমার বাসা ? তাই তো,···তা সেটা আবার কোথায় ?'

'সি. আই. টি বিল্ডিংস, সিংহীবাগান। জেড্‌-সিক্স্‌। মনে থাকবে ?'

'থাকা মুশকিল। দাঁড়াও, লিখে নিচ্ছি। কত বললে ? জেড্‌ সিক্স্‌ ? রাস্তাটা—?'

মীরা আবারও পুরো ঠিকানাটা বলল, আস্তে আস্তে। মনে হ'ল আর কাকে যেন বলছে ঠিকানাটা সহদেব, সে-ই লিখছে।

'সিংহীবাগানটা কোথায় বললে ? জোড়াসাঁকো ?···আচ্ছা, ঠিক আছে। যাব একদিন ।'

'একদিন !.. প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও একটা হতাশার সুর ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে: 'আজ আসতে পার না ?'

নিজের নির্লজ্জতায় নিজেই অবাক হয়ে যায় মীরা।

'আজ ! বাঃ ! আজ কী ক'রে হয় ?'

'কেন ? আজ তো তোমার কোথাও গান নেই ।'

ছি ছি ! এ ওর কী অধঃপতন ! কী ক'রে এসব কথা বলতে পারছে সে !

এমন ক'রে টানা-হেঁচড়া করার আগে গলায় দড়ি দেওয়াই যে উচিত ছিল।

অন্তত কয়েক মাস আগে হ'লে সেই পরামর্শই অপরকে দিত মীরা—এই রকম ক্ষেত্রে।

'তা অবশ্য বটে।...আচ্ছা বল তো আজই—। রাত্রে যাব, কেমন ?'

'হাাঁ। তাই এস। আর—আমি বলছিলুম কি, ওখানেই খেও।'

'খাব ? তা বেশ তো ! অবশ্য আজকাল খাওয়া-দাওয়ায় আর তেমন ঝোঁক নেই। তবু—। তোমার হাতে না হয় খাবই কিছু কিছু। তুমি রাঁধ এখনও ? এখন তো তুমি রোজগেরে বাবু। ঝি রাঁধে নিশ্চয় !'

'হ্যাঁ আমার মতো ঝিই রাঁধে—তা আজ আমিই রাঁধব।'

'না, না। তার জন্য কিছু নয়। ঝি রাঁধলেও আমার আপত্তি নেই। আমি তো এখন সর্বভুক্। সর্বত্র সকলের হাতেই খেতে হয়। মিছিমিছি তোমার আর কষ্ট করার দরকার নেই !'

'না না—একেবারে যে রাঁধি না তাও তো নয়। ভাইপোরা কি বন্ধুবান্ধব কেউ এলে তো রাঁধতেই হয় !'

'তাই নাকি ? এখনও সেই রকম ধোঁকার ডালনা করতে পার ?'

'তা জানি না, বোধ হয় পারি। ধোঁকার কথা মনে আছে এখনও তোমার ?'

'খু ব ! খু-ব ! আচ্ছা, তা হ'লে ঐ কথাই রইল। এদিকে আবার আমার তবল্‌চী এসে বসে আছে, রেওয়াজ করতে হবে। নমস্কার ! নমস্কার !'

নমস্কার ! চমকে উঠল মীরা। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি সহদেবের ?

না কি তাকে চিনতেই পারে নি শেষ পর্যন্ত !

অন্য কেউ ভেবে এতক্ষণ আলাপ ক'রে গেল ?

এই রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অপরের সঙ্গেও তা হ'লে গড়ে উঠেছিল বুঝতে হবে।

মুহূর্তেরও ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের জন্য বোধ হয়—একটা জ্বলন্ত, তীক্ষ্ণ, তীব্র সংশয় ও ঈর্ষা বুকের মধ্যে অনুভব করল মীরা।

তার পর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করল জোর ক'রে।

না—বণ্টুর সুদ্ধ নাম করলে যখন— ! তা ছাড়া ধোঁকার ডালনার কথাটাও। এককালে ওর সত্যিই খুব দক্ষতা ছিল ঐ রান্নাটায়। আসলে অন্যমনস্ক হয়েই অভ্যাসমতো নমস্কার জানিয়েছে। মনটা অন্যদিকে ছিল তাই—

স্বস্তির হাসি ফুটে ওঠে মীরার মুখে।

॥ ১২ ॥

অকস্মাৎ যেন ছেলেমানুষ হয়ে ওঠে মীরা। বয়স যেন পাঁচটা নয়, দশটা নয়—পুরো কুড়িটি বছরই কমে যায় ওর।

এতক্ষণের সমস্ত জড়তা কোথায় মিলিয়ে যায়। পা দুটো লঘু হয়ে ওঠে—এত লঘু যে মনে হয় তাতে পাখা গজিয়েছে।

আসলে মনটাই হালকা হয়ে উঠেছে। তাতে লেগেছে খুশির বাতাস। অনেক—অনেক দিনের জমাট-বাঁধা কালো নৈরাশ্যের মেঘ উড়ে গেছে সে বাতাসে।

একটা অপ্রত্যাশিত আশা ও আনন্দের দক্ষিণা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে সে মেঘ। সেই সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বহু বৎসরের বহু ইতিহাস। তার গত জীবনের বহু বিবস্বাদ-তিক্ত স্মৃতি।

উড়িয়ে নিয়ে গেছে ওর মনের পুঞ্জীভূত হতাশা আর বেদনা।

আশা?

না, ঠিক স্পষ্ট কোন আশা হয়ত নেই। আশা সে কিছু করেছে কিনা তাও এখন ভাববার সময় নেই।

শুধু সে খুশী হয়েছে। খুশী হয়েছে।

আর সেই খুশির জোয়ারে—আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে—তার বয়সটা কোথায় গেছে ভেসে। তরুণীর চাঞ্চল্য জেগেছে ওর হাতে পায়ে—দেহে মনে।

সে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসেই একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসল।

অফিসের সময় নয় এখন—ট্রাম ও বাস দুই-ই খালি যাচ্ছে কিন্তু এ সময়ে ওসব মন্থর যানবাহনের কথাই ভাবাই যায় না।

ট্যাক্সিটাই যথেষ্ট জোরে চলছে না বলে মনে হচ্ছে ওর।...

ওর মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলা তো সম্ভবই নয়।

সম্ভব নয় তা সেও জানে, তবু তার মনে যে আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠেছে তখন—তাতে এত যুক্তি এত তথ্য বিচার করার অবসর নেই।

সে অসহায় ও অকারণ ব্যস্ততায় গাড়ির মধ্যে আড়ষ্ট সোজা হয়ে বসে রইল, হাতটা বার বার মুঠো করতে ও খুলতে লাগল।

বাড়িতে ফিরে দেখল পরীর মা রান্নাবান্না সেরে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে।

এমন অসময়ে ও অকারণে এত দেরি করা মীরার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং তার উদ্বেগ স্বাভাবিক।

বিশেষ ক'রে আহারাদি সম্বন্ধে নিয়ম মেনে চলার পক্ষপাতী বলেই তাকে জানে পরীর মা।

নিমেষে অনুতপ্ত হয়ে উঠল মীরা। হয়ত একটু বেশিই হ'ল।

মীরা অমায়িক—তবু এতটা অন্তরঙ্গতা অভূতপূর্ব। পরীর মা'র অভিজ্ঞতার বাইরে।

একেবারে পরীর মা'র হাত ধরে মীরা বললে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে—না পরীর মা ?…বড্ড একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছিলুম।…তুমি এক কাজ কর—আমার ভাতটা বেড়ে চাপা দিয়ে রেখে তুমি খেয়ে নাও। বরং না হয় ঐ টেবিলটার ওপর রেখে দাও, তা হ'লে রান্নাঘরের কাজ সেরে ঘর ধুয়ে নিশ্চিন্তি হতে পারবে!'

পরীর মা তীব্র প্রতিবাদ করে।

'ওমা, এত বেলায় তুমিই বা আবার দেরি করতেছ কেন ? চানটা সেরে নাও না বাপু, একসঙ্গেই খেয়ে নিতে পারব। এমনিই তো ভাত কড়কড়া হয়ে উঠেছে—আবার বেড়ে রাখলে ওর কী থাকবে ? নাও, নাও, তুমি চান সেরে নাও। এত বেলা যেকালে বসে অইলুম, আর দু'দণ্ড পারব নি ?'

মীরা আরও মিনতি করে, 'না, না পরীর মা, লক্ষ্মীটি—আমার জন্যে তুমি খামকা বসে থেকো না। আমার একটু কাজ আছে—সেরে নিই। তার পর স্নান ক'রে খাব। সারা সকাল খাটাখাটি কর—তোমার একটু বিশ্রাম ক'রে নেওয়া দরকার। তাছাড়া ওবেলা—ওবেলা ঢের কাজ আছে। হ্যাঁ—গ্যাখো, বরং দুটি ডাল ভিজিয়ে দাও দিকি এই বেলা—মটর ডাল।'

ওর ভাব ভঙ্গীতে পরীর মা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

'ব্যাপারটা কি বল দিকি ?…কী হয়েছে আজ তোমার ?'

'বিকেলে এক ভদ্রলোক খাবেন এখানে।'

'কে, তোমার ঐ রমিয়বাবু ?'

'না গো—অমিয়বাবু নয়। এ আর একজন। খুব বড় লোক। খুব বড় লোক। আসবে—ঘরে বসবে তো। ঘরদোরগুলো একটু সাফ্-সুত্রো ক'রে নেওয়া দরকার।'

'বাবা,—এমন কে নোক আসবে, যে ঘর-দোর সাজাতে নাগতে হবে এখুনি ? বলি নাটবেলাট কেউ আসবে নাকি গো ?'

পরীর মা অবাকই হয় একটু।

সে অবশ্য বেশী দিন এখানে আসে নি, তার চাকরি মোট বছর তিনেক—তবু এর মধ্যে ইস্কুলের দু'একজন শিক্ষয়িত্রী ও পুরুষের মধ্যে অমিয়বাবু ছাড়া আর কাউকে কখনও পাতা পাততে দেখে নি এ বাড়িতে।

তা—তারা তো এমনিই আসে যায়—কৈ, তাদের জন্যে ঘর-দোর সাজানোর তো দরকার হয় নি কোন দিন।

মীরা অপ্রতিভভাবে হেসে বলে—'না, সেজন্যে নয়—বড্ড অগোছালো হয়ে আছে তো। প্রথম আসবে ভদ্রলোক—কী মনে করবে।'

সে আর বাদানুবাদের অবসর দেয় না, পরীর মা'কে একরকম ঠেলে রান্নাঘরের দিকে পাঠিয়ে নিজে কোমর বেঁধে ঘরটা গুছোতে লেগে যায়।

পরীর মা অগত্যা ওর ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে নিজে খেতে বসে।

কিন্তু একটা অস্বস্তি তার থেকেই যায়। এই দীর্ঘ তিন বছরের অভিজ্ঞতায় দিদিমণির এমন ব্যবহার কখনও দেখে নি সে। আজ যেন একেবারে বদলে গেছে মানুষটা, বলতে গেলে খোশামুদিই করছে ওর। ব্যাপার কী?

॥ ১৩ ॥

ঘরদোর সাজিয়ে বিছানার চাদর ওয়াড় পাল্‌টে স্নান ক'রে আসতে আসতে তিনটে বেজে গেল।

এত দেরি হ'ত না ঠিক—কিন্তু আজ যেন কিছুই পছন্দ হয় না।

চাদরই পাল্‌টাল তিনবার। ছোট টীপয়টাকে বারকতক বিভিন্ন জায়গায় রেখে দেখল কেমন দেখায়।

তাছাড়া, তাড়াতাড়ি করতে যাচ্ছে বলেই বোধ হয়, কেবলই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কাজে—এক কাজ দু'বার করতে হচ্ছে।

এমনি ক'রে শেষ পর্যন্ত গৃহসজ্জা শেষ হ'ল যখন তখন আর খাওয়ার ইচ্ছা রইল না ওর।

সকালের রান্না—ঠাণ্ডা ভাত-তরকারি খেতেও পারবে না সে। দীর্ঘকাল অভ্যাস নেই।

কাজেই সে চেষ্টাও সে করল না। পরীর মাকেও ডাকল না।

শুধু শুধু চেঁচামেচি করবে—খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবে—হয়ত বা স্টোভ জ্বেলে লুচি ভাজতে বসবে।

সময় নষ্ট তো বটেই—তাছাড়া এখন যেন এসব নিয়ে কথা-কাটাকাটি করাও অসহ্য।

নিজেই চা ক'রে নিল এক কাপ।

রান্নাঘরের তাক খুঁজে ইতিমধ্যে খানকয়েক বিস্কুটও পাওয়া গেছে।

সেই বিস্কুট আর চা খেয়েই তখনকার মতো ও-পাটে ইতি টানল সে।

তাও গোগ্রাসেই খাওয়া বলতে গেলে—নিজের খাওয়ার মতো তুচ্ছ কাজে সময় নষ্ট করতে আদৌ ইচ্ছে করছে না তখন।

কাপড় পালটে বাইরে বেরোবার মতো বেশে সজ্জিত হয়ে একেবারে বেরোবার সময় পরীর মাকে ডেকে তুলে দিল।

উঠে বসবার পরও তার কাঁধটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'ও পরীর মা, উঠে পড় এবার।... শোন, আমি নিজেই বাজার যাচ্ছি। তুমি এক কাজ কর, এর মধ্যে উনুনে আঁচ দিয়ে কিছু কিছু মশলা পিষে রাখো, আর ঐ মটর ডাল ক'টাও বেশ আঁট ক'রে বেটে রেখে দাও। আরও একটা কাজ কোরো বরং—ওপরের

মিসেস সেনের ওখান থেকে ওঁর তোলা উনুনটাও চেয়ে এনে রেখো। দুটো উনুনই জ্বালাতে হবে বোধ হচ্ছে।'

পরীর মা'র আজ দুপুর থেকেই বিস্ময়ের সীমা নেই, দিদির মতিগতি ভাবভঙ্গী কিছুই বুঝতে পারছে না সে। এখনকার এই অদ্ভুত নির্দেশও ভাল মাথায় ঢুকল না তার।

সদ্য নিদ্রাভঙ্গের জড়তা নিয়ে সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েই বসে রইল শুধু।

'বলি, কথাগুলো শুনলে? মাথায় রইল তো! নাকি এসে দেখব চুপ ক'রে বসে আছ?'

একটু অসহিষ্ণু ভাবেই প্রশ্ন করে মীরা।

'না না—বসে থাকব কেন? দুটো উনুন ধরাব, সব রকম মশলা বাটব আর ডাল ক'টা বেটে রাখব—এই তো!'

'প্রায় এই। শুধু ওপরের উনুনটা এখন ধরাতে হবে না—চেয়ে এনে সাজিয়ে রেখো। আমি চললুম!'

'তা বলি তোমাকে বাজারে যেতে হচ্ছে কেন? আমিও তো যেতে পারতুম!'

কিন্তু সে-সব কথা সম্ভবত মীরার কানেই ঢোকে না, সে প্রায় ঝড়ের বেগেই বেরিয়ে যায়।

দুটো তিনটে ক'রে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে নামে ছোট মেয়ের মতো।

আপনমনে গজগজ করে পরীর মা, 'কে খাবে, ক'জন খাবে কিছুই তো জানম্ব না—মশলা কি বাটব আন্দাজে! আজ কি হয়েছে বাপু যেন মেয়েমানুষটার, বাতাস-টাতাস নাগল কিনা কে জানে!'

মীরা প্রথমেই গেল নতুন বাজার। কিন্তু সেটা তখনও বাজার বসবার সময় নয়। কাঁচা বাজার পাওয়া যাবে, দোকানও খোলা—কিন্তু মাছ মাংস নেই।

মীরার কিন্তু তখন অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য নেই। সে ওখান থেকে শ্যামবাজারে যায়, সেখান থেকে মানিকতলা। সর্বত্রই ঐ অবস্থা। অগত্যা আবার নতুন বাজারে ফিরে আসে। মুটে ডেকে ঘি-ময়দা কেনে, চিনি কেনে বড় দানা দেখে, গরম-মশলা নিজে বেছে বেছে নেয়। বাদাম কিশমিশ কেনে। নানান আনাজ, বড় বড় নৈনিতাল আলু। তার পর মুটের মাথায় বোঝাই দিয়ে সেই একরাশ বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে এক বার।

পরীর মা গালে হাত দিয়ে বলে, 'মাগো! খাবে তো বললে ত্যাখন একজন

লোক—এ করেছ কী! এ যে বারো জনের বাজার।'

'তুমি বোঝ না পরীর মা। বাজার কি ফেলা যায়? না হয় তিন দিন ধরেই খাব। আর ঘি ময়দা চিনি মশলা—এর কোন্‌টা কাজে লাগে না শুনি?'

সে আর দাঁড়ায় না। কুটনোগুলোর মোটামুটি নির্দেশ দিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যায়।

ট্যাক্সি ক'রে চলে যায় সিমলেয়—সেখান থেকে দই সন্দেশ রাবড়ি কেনে। এইবার সোজা যায় নিউমার্কেটে।

এতক্ষণে মাথায় বুদ্ধি খুলেছে। আশ্চর্য, নিউমার্কেটের কথাটা আগে মনে পড়ে নি কেন! তা হ'লে তো কখন হয়ে যেত! বাইরে গাড়ি রেখে, দই আর রাবড়ির ভাঁড়টা ড্রাইভারকে ঠিক ক'রে রাখতে বলে নেমে যায় মাছ মাংসের বাজারে। বেছে বেছে গলদা চিংড়ি কেনে, ফ্রাইয়ের মাছটা স্লাইস ক'রে কাটিয়ে নেয়—গ্র্যামফেড্ মাটনও নেয় খানিকটা।

তার পর প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে গাড়িতে চাপে। দেরি হয়ে গেছে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। কখন কী করবে—একঘর রান্না যে!

বাড়িতে পৌছেই কোমর বেঁধে রাঁধতে লেগে গেল মীরা।

দুটো উনুন জ্বাললে, ওধারে হিটারেও কিছু কিছু কাজ চলল।

একটা উনুনে মাংস চাপিয়ে দিলে, আর একটায় ভাজা, ডালনা, মাছের কালিয়া।

ফ্রাইটাও একমেটে-মতো ভেজে রাখলে।

খাবার সময় আর একবার গরম ক'রে দিলেই হবে।

দুরূহ রান্নাগুলো নিজে হাতে করলে—ভাজাভুজি এবং যোগাড় দেওয়ার কাজটা চাপিয়ে দিলে পরীর মা'র ওপর।

পরীর মা'র আজ বিস্ময়ের শেষ নেই।

দিদির এত উৎসাহ কখনও দেখে নি সে - সে যে এত খাটতে পারে তা-ও ওর ধারণা ছিল না।

কী হয়েছে আজ দিদির? কে খাবে—এমন মানুষ কে— যার জন্যে এত কাণ্ড?

সে কেবলই আড়ে আড়ে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে দিদির কাণ্ডকারখানা!

কৌতূহল অবশ্য চেপে রাখতেও পারে না বেশীক্ষণ—প্রশ্নও করে মধ্যে মধ্যে; ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চেষ্টা করে, আজকের এই বিশিষ্ট অতিথিটি কে—কিন্তু মীরা কোন উত্তর দেয় না—মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে শুধু।

হয়ত বলে, 'দেখবে দেখবে—দেখতেই তো পাবে।···চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবেই একসময়, আর দুটো ঘণ্টা ধৈর্য ধরে থাকো না বাপু!'

যখন কথা বলে না, শুধু মুচ্‌কি হাসে, তখন লজ্জা আর আনন্দের রক্তাভায় ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—মনে হয় সত্যিই ওর বয়স অনেক কমে গেছে।

এই প্রথম মনে হয় পরীর মা'র যে মীরা দেখতে খারাপ নয়—বরং 'সোন্দরই' বলা যায়।

একেবারে প্রথম যখন নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর মিলল মীরার তখন রাত ন-টা বাজে।

চমকে উঠল সে প্রথমটায়। এত রাত হয়ে গেছে? সে গা-হাত ধোবে কখন?

তার পর অবশ্য নিজে-নিজেই আশ্বস্ত হয়, মোটামুটি রান্না শেষ হয়ে গেছে, যেটুকু বাকী আছে, সেটুকু পরীর মা-ই সারতে পারবে। মাংসটা নামানো আর লুচির ময়দাটা মেখে রাখা—এই তো!

মীরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাথরুমে গেল।

তার হিসেবে অবশ্য খাবার সময় পেরিয়েই গেছে, কিন্তু ওরা গাইয়ে-বাজিয়ে লোক—ওদের সন্ধ্যেই হয় রাত দশটায়।

তাছাড়া সহদেবের তো চিরকালের অভ্যাস দেরি ক'রে ফেরা।

সুতরাং এখনই সে আসছে না।

হয়ত রাত এগারোটাই বাজবে—কী আরও বেশী।

তবু প্রস্তুত থাকা ভাল। তাকে বসিয়ে কিছু রাঁধতে যাওয়া চলে না। দুটো উনুনেই ভাল ক'রে কয়লা চাপিয়ে রাখতে বলেছে পরীর মাকে।

এলে—খাবার সময় একটাতে সব গরম ক'রে ক'রে দেবে—আর একটায় লুচি ও ফ্রাই ভাজা চলবে—

স্নান সেরে বেরিয়ে অন্য দিনের চেয়ে একটু যত্ন ক'রেই প্রসাধন করল মীরা।

অবশ্য কী-ই বা আছে প্রসাধনের!

রঙীন শাড়ি পরা বহুকালই ছেড়ে দিয়েছে, অলঙ্কার বলতেও দু'গাছি বালা এবং সরু একটি হার।

ইচ্ছে ক'রেই বেশী গয়না পরে না সে—ছাত্রীদের সামনে কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয় ওতে।

চুড়ি ক'গাছা আছে অবশ্য—অমিয়বাবু জোর ক'রে গড়িয়ে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন—'এটা সম্পত্তি হিসেবেই মনে করা উচিত, তাছাড়া ইস্কুলের বাইরেও তো কখনও কখনও পরবার অকেশ্যন হতে পারে।...ঘরে সোনা থাকাও ভাল কিছু, বিপদের সময়—হঠাৎ দরকার পড়লে অর্ধেক রাতে টাকা পাওয়া যায়, বাড়িই থাক আর ব্যাঙ্কেই টাকা থাক যখন তখন টাকা বার করার কোন উপায় নেই।'... অনেক ইতস্তত ক'রে সেই চুড়িগুলোই বার করল আজ।

আর লালপাড় একটা সাদা গরদের শাড়ি। এবারকার পুজোয় অমিয়বাবুর উপহার।

চুড়িগুলো ব্যবহার না করার ফলে এখনও নতুনের মতো চক্‌চক্ করছে—সেজন্য ভারি লজ্জা করতে লাগল মীরার।

চুলে হাত ঘষে ঘষে তেল নিয়ে চুড়ির গায়ে মাখাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে যে তাদের ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র কমল বলে মনে হ'ল না।

খুলেই ফেলবে নাকি? বিশেষত পুরনো বালার পাশে বড়ই যেন বেমানান দেখাচ্ছে চুড়িগুলো—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এগুলো তোলা গয়না।

কিন্তু—

শেষ পর্যন্ত খোলা হ'ল না। মাত্র দু'গাছি বালা হাতে দিয়ে এতকাল পরে বেরোবে তার সামনে?

থাক। অত লক্ষ্য করবে না সে। অত যদি তার নজর সাফ হ'ত তা হলে আর ভাবনাই থাকত না। জীবনই তো বইত অন্য খাতে।

মুখেও দীর্ঘকাল পরে পাউডার দিল একটু।

পাউডার আর স্নো।

কিন্তু তাও—শুকনো কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে তার প্রকট চিহ্নটা বিলোপ করার চেষ্টা করল।

যাতে তার বর্ণাভাটা থাকে কিন্তু উপস্থিতিটা না বোঝা যায়।

এতকাল পরে সেজেগুজে স্বামীর মন ভোলাতে যাবে সে?

ছিঃ!

তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।

অবশ্য এ কথাটা ওর মনে হ'ল না, মনে করিয়ে দেবার লোকও ছিল না যে, এতক্ষণ ধরে ও যেটা করল—সেটাও সাজসজ্জাই।

এইবার শুরু হ'ল প্রতীক্ষা।

ঘরদোর সাজানো-গোছানো ফিটফাট—এমনই সাজানো যে কোথাও বসতে ইচ্ছা করে না—পাছে লাট হয়ে যায়।

সে সন্তর্পণে একটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে বাইরের খোলা বারান্দাটায় বসল।

আসবে তো শেষ পর্যন্ত ?

তার তো কাণ্ড! আর যা কথাবার্তার ধাঁচধরন শুনল টেলিফোনে—স্বভাব এতটুকু বদলায় নি! শেষ অবধি ভুলেই যাবে না তো!

এই পরিশ্রম আর অর্থব্যয়। মাগো! একঘর খাবার।

পরীর মা-ই বা কি মনে করবে! যদি না আসে তো কাল সকালে আর মুখ তুলে তার মুখের দিকে চাইতেই পারবে না সে।

কিন্তু—এতকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে কথা হ'ল—স্ত্রীকে কথা দিলে আসবে বলে—সেটাও ভুলে যাবে ?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান একটা হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে, অন্ধকারেই।

সে হাসি ব্যঙ্গের।

সে হাসি ওর অজ্ঞাতসারেই ওর ধারণাকে বিদ্রূপ ক'রে গেল।

যৌবনেই বা স্ত্রীর কী দাম ছিল ওর কাছে—তা আজ!

বিশেষত এই এতকাল পরে—দীর্ঘকাল অদর্শনের পর।

স্ত্রীর স্মৃতি, সে বিবাহিত জীবনের স্মৃতি তো ঝাপ্সাই হয়ে আসবার কথা এত দিনে।

তাছাড়া কে জানে অন্য নারীই কেউ এসেছে কিনা এর মধ্যে ওর জীবনে।

এক কিংবা একাধিক!

আসাই তো উচিত।

এত খ্যাতি, এত যশ, এতবড় প্রতিভা। ওর পায়ে নিজেদের নিঃশেষ ক'রে দিয়ে কৃতার্থ, পরিপূর্ণ হবার মতো মেয়ে কম নেই এদেশে—তা সে জানে।

ইচ্ছা করলেই যে কাউকে বা অনেককে বেছে নিতে পারে সহদেব।

ওর মতো খ্যাতনামা শিল্পী অনেকেই তো তা নিয়েছেও—

সে-ও তাই নিয়েছে নাকি ?

তা যদি হয় তো—এখন কোথাও নিভৃতে বসে হয়ত মীরার এই ধৃষ্টতা এবং দুরাশা নিয়ে হাসাহাসিই করছে তার সঙ্গে! কে জানে!

হয়ত তার বিবাহিতা স্ত্রী, বহুদিনের পুরাতন স্ত্রীকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক'রে সেই নবতমার মনোরঞ্জন করছে।

আর তা করলেও খুব দোষ দেওয়া যায় না সহদেবকে।

যে স্ত্রী তার দুঃসময়ে ত্যাগ ক'রে এসে আজ সুসময়ে যেচে কাছে আসতে চায়—তার স্বার্থান্ধ লোলুপ মনোভাবটা নিয়ে যদি সে হাসাহাসিই করে তো—মীরার কী বলবার আছে?

সংশয় ও সম্ভাবনাটা মনে আসায় সঙ্গে সঙ্গেই মীরার কপালে ঘাম দেখা দিল অকস্মাৎ।

যেন অবশ হয়ে এল হাত-পা।

বুকে যেন কিসের অস্থিরতা অনুভব করতে লাগল।

কিছুক্ষণ অবশ বিহ্বল হয়ে বসে থাকার পরই যেন জোর ক'রে মনকে শক্ত করল মীরা।

শিথিল হয়ে যাওয়া স্নায়ুগুলোকে গুছিয়ে কর্মক্ষম ক'রে তুলল।

এর চেয়ে ঢের বিপদের, ঢের দুঃখের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে তাকে—এখন সামান্য সম্ভাবনায় এলিয়ে পড়লে চলবে না।

এমন হ'লই বা কেন তার?

মীরার মনে পড়ল সারাদিন প্রায় কিছুই খাওয়া হয় নি।

পরীর মাকে একটু চা ক'রে দিতে বলবে নাকি?

মন্দ নয়। একটু চা আর সামান্য কিছু খাবার খেলেই দেহে-মনে অনেকটা বল আসবে।

মীরা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু চায়ের ফরমাশ দেওয়া আর হয়ে উঠল না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল একটা প্রকাণ্ড কালো রঙের গাড়ি ঢুকছে ওদের হাতাতে।

আশা আশঙ্কায় জর্জরিত হয়ে থমকে থেমে গেল মীরা। বুকটা কাঁপতে লাগল দুর-দুর ক'রে।

॥ ১৪ ॥

সহদেব এল তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে। রাজাবাহাদুরের প্রকাণ্ড গাড়িখানা ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। শেষ মুহূর্তে মীরার আশঙ্কা হয়েছিল—সহদেবের তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—হয়তো আরও কাউকে জুটিয়ে আনবে। নামলও গাড়ি থেকে কে একজন, কিন্তু ফ্ল্যাটের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই সে ফিরে গেল।

'এত রাত হ'ল ?'

দোরের কাছ থেকেই প্রশ্ন করে মীরা। নিজের অজ্ঞাতেই একটু তীক্ষ্ণতা বাজে বুঝি গলায়।

'রাত কি ! একেও কি রাত বলবে নাকি ? ও হরি, মাস্টারী ক'রে ক'রে তুমি একেবারে খুকী হয়ে গিয়েছ দেখছি !'

হো হো ক'রে হেসে ওঠে সহদেব। সেই ঘর-দ্বার-পূর্ণ-করা হাসি !

মীরার বুকটা কেঁপে ছলাৎ ক'রে ওঠে যেন। এ হাসি কতকাল পরে শুনছে সে।

'এই তো সবে সন্ধ্যে। আমরা তো দিবানিদ্রাই দিয়ে উঠি রাত আটটা-নটায়। দশটা থেকে সন্ধ্যে শুরু হয় আমাদের।'

চাওয়া যায় না, চোখ তুলে তাকানো যায় না কিছুতেই, চোখ যেন বিদ্রোহ করে, মুখ উঠতে চায় না।

তবু শেষ পর্যন্ত কোন রকমে সহদেবের দিকে চেয়ে দেখে মীরা।

তেমনিই আছে প্রায়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বরং আগেকার চেয়ে সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবানই হয়ে উঠেছে—কিন্তু মীরার মনে হ'ল এ কান্তির আড়ালে অস্বাস্থ্যেরই ছাপ আছে একটু। যেটাকে ফরসা রঙ মনে হচ্ছে, সেটা হয়তো আসলে বিবর্ণতা ছাড়া আর কিছু নয়।

তবু বেশ দেখাচ্ছে, ভালই দেখাচ্ছে। বেশভূষাও ভাল। গরদের পাঞ্জাবি, হাতে অনেকগুলো কী সব পাথরের আংটি। চুলগুলো কিছু পাতলা হয়ে গেছে—কিন্তু এখনও বেশ সুবিন্যস্ত।

ওকে পথ দেখিয়ে একেবারে ঘরেই নিয়ে এল মীরা। ঘরের মধ্যে ঢুকে বেশ প্রশংসাসূচক একটা শব্দ করল সহদেব, 'বা বেশ ঘরটি তো ! ভারি সুন্দর। খুব হালকা, অথচ আরামের সব ক'টি জিনিসই হাতের কাছে, এ-ই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। এমনি একটি ঘর—আর আসবাবই আমার পছন্দ। সত্যি বলছি,

ঐসব বড়লোক রাজা-মহারাজাদের বাড়িতে বড় বড় ঘর বটে, কিন্তু এত আসবাব—আমার যেন হাঁফ ধরে। বাঃ, সাজিয়েছও বেশ!'

সে ওপাশের চেয়ারটাতে বসতে যাচ্ছিল, মীরা তাড়াতাড়ি বলল, 'তুমি বিছানাতেই বোস। তোমার তো আবার কাত হয়ে বসা অভ্যেস—'

'তা যা বলেছ। চেয়ার-ফেয়ারে আমি বসতে পারি নে।' তার পরই—বসতে গিয়ে বুঝি কথাটা মাথায় যায়—'তুমি দেখছি এখনও কিছুই ভোল নি—'

মীরা কি অকস্মাৎ লাল হয়ে উঠল? কানের কাছটা কি উত্তপ্ত হয়ে উঠল সহসা?

অন্তত ওর গায়ে যে কাঁটা দিয়ে উঠল অকারণেই, এটা সে স্পষ্ট অনুভব করল।

সহদেব তাকিয়ার অভাবে মীরার পাশবালিশটাই টেনে জুৎ ক'রে বসে বলল, 'আসা তো মোটেই হচ্ছিল না—আর একটু হ'লে। শেষ মুহূর্তে যাচ্ছিল সব ভেস্তে। হঠাৎ আমার দুই গাইয়ে বন্ধু এসে হাজির। দু'জনেই এসেছে গোয়ালিয়র থেকে। তা রাণীসাহেবা তো আস্ত পাগল—তিনিই কায়দা ক'রে তাদের তাড়িয়ে আমাকে একরকম জোর ক'রে এখানে পাঠিয়ে দিলেন। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুনে পর্যন্ত কী যে করছেন ভদ্রমহিলা! পাগল একেবারে! ওঁরা কেউই জানতেন না তো যে—তুমি—মানে আমার স্ত্রী আছেন কেউ।...আমাকে কী বকুনি—বলে, এতদিন বলেন নি কেন? গিয়ে আলাপ করতুম, ধরে নিয়ে আসতুম।... আমি বলি যে ভাগ্যিস সে-কাজ করতে যান নি! কারণ সে বিশেষ সুবিধা হ'ত না। সে ইস্কুলমাস্টার মানুষ, এসব গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়েদের বিশেষ পছন্দ করে না। তাছাড়া শুনেছি খুব রাশ ভারীও হয়ে উঠেছে। তা তিনি কি সে-সব কথা কানে তোলেন? কত ক'রে বললুম জয়ন্তকে, মানে ওঁর সেক্রেটারিকে, যে সঙ্গে চল—তা রাণীজি কিছুতেই আসতে দিলেন না। ওঁর বিশ্বাস তুমি এখনও—ইয়ে—মানে তোমার সঙ্গে আমার সেই রকম ভাব আছে। কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না যে, তোমার সমস্ত ছেদ্দাভক্তি ভালবাসা আমি খুইয়ে বসে আছি চিরকালের মতো। যে ছোকরা সঙ্গে এসেছিল, ও আমার এক শাগরেদ—ওকে একেবারে মাথার দিব্যি দিয়ে দিলেন রাণীজি, যেন কিছুতেই ভেতরে না ঢোকে। পাগলী একেবারে! আস্ত পাগল!'

হো হো ক'রে হাসতে লাগল সহদেব। সেই হাসি!

মীরা আর দাঁড়াতে পারল না, চা আনবার অছিলা ক'রে বেরিয়ে গেল।

আর এক মুহূর্তও যেন সহ্য হচ্ছিল না এ ঘরের বাতাস।

মনে হচ্ছিল বুকটা ফেটে যাবে বুঝি এখনই।

একটু খোলা বাতাস দরকার।

পরীর মা সহদেবকে আসতে দেখেই চা চড়িয়েছিল, খুব তাড়াতাড়িই তৈরি হয়ে গেল। অতিথি কে আসছে কিছুতেই বলে নি মীরা—অনেক পীড়াপীড়িতে একবার শুধু বলেছিল, 'খুবই নিকট আত্মীয়; তোকে পরে বলব।' তবু দিদি আজ সারা দুপুর ধরে বাজার ক'রে সারা বিকেল এবং সন্ধ্যা ধরে নিজে রান্না করায় তার অনুমানটা এতক্ষণে সত্যের কাছাকাছিই গিয়ে পৌঁছেছিল প্রায়। তাই মীরা যখন বললে, 'তুমি দিয়ে আসবে চা-টা পরীর মা?' তখন সে মুখ টিপে হেসে জবাব দিলে, 'না বাপু! সে কি ওঁর ভাল লাগবে—তুমিই যাও।'

অগত্যা আবার চা নিয়ে—বলতে গেলে তখনই—ঢুকতে হ'ল মীরাকে।

'এ কি, চা?…ওঃ, এই চা চাওয়া নিয়েই তুমি চলে এসেছিলে, মনে আছে?… তার পর থেকে বহু দিন কিন্তু সত্যিই চা খাই নি—বিশ্বাস করো। আমি যে আমি —আমারও কেমন একটা ঘেন্না ধরে গিয়েছিল চা খাওয়ায়। ধিক্কার এসেছিল মনে। তার পর অবশ্যি—জানোই তো—এ লাইনে চা না খেলে চলে না।…আবার ধরলুম।'

বুকের কাছটা এমন ব্যথা করছে কেন মীরার? যেন পিষে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সারা বুকটা।

'তা তুমি বাড়ি থাক না কেন?' অতি কষ্টে উদ্যত অশ্রু দমন ক'রে প্রাণপণ চেষ্টায় প্রশ্ন করে মীরা।

'বাড়ি? মানে দাদার বাড়ি? ন্‌ না। ওরাও তো তত—তাছাড়া মা নেই, তুমি নেই—বাড়ি আর কী বলো! আসল কথা কি—আমাকে কোথাও যে থাকতে দেয় না। প্রতি দিনই টানাটানি কাড়াকাড়ি—এই তো আজ ভোরেই ধরো না— তিন-তিনখানা গাড়ি প্যাণ্ডালের বাইরে দাঁড়িয়ে,—টানাটানি, না গেলেই মান-অভিমান!·বলো কেন! আমার যেন জ্বালা হয়েছে এক!·শুধু কি এখানে? সেই দিল্লী থেকে, কাশ্মীর থেকে শুরু ক'রে ওধারে বম্বে পর্যন্ত—যেখানে যাব সেখানেই এই কাড়াকাড়ি। নিজের ঘর কি বাড়ি, কি কোথাও একটু নিরিবিলি থাকার কথা—ভুলেই গেছি এক রকম।'

মীরা জানলার ওপরের ফুলদানিটা নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'তাছাড়া', শ্রোত্রীর মনোযোগ আছে কি নেই অত খেয়ালও করে না বক্তা,

আপন মনেই বলে যায়, 'তাছাড়া প্রথম প্রথম আমারও যে খুব খারাপ লাগত এই টানাটানি—তাও নয়। অনেক দিন ধরে অবহেলাই সয়ে গেছি তো, প্রথম প্রথম একটা নেশা লাগত যেন। নিজেরই বিশ্বাস হ'ত না যে আমাকে নিয়েই এরা এত কাণ্ড করছে, সত্যিই আমার কিছু দাম আছে। এখন অবিশ্যি আর ভাল লাগে না—কিন্তু এখন আর উপায় কি বল।'

মীরা, তেমনি ওর দিকে পিছন ফিরেই, কেমন যেন আল্‌গাভাবে প্রশ্ন করে, 'তোমার—তোমার রেকর্ড আছে ?'

'আছে বৈকি। তবে আমাদের গান সাধারণ রেকর্ডে তো ধরে না—স্পেশাল সাইজের রেকর্ড করতে হয়। আছে তবু দু'চারখানা। বরং একদিন এক সেট পাঠিয়ে দেব শুনো।'

তার পর কী মনে ক'রে আপন মনেই হেসে ওঠে একটু, টান্ হয়ে শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'তুমি আমার গান শোন নি—না ? তুমি তো বিশ্বাসই করতে না আমি সত্যি-সত্যিই গান-বাজনা শিখি কোথাও! আমি যে কোন দিন গাইয়ে হ'ব—এ তোমরা কেউ বিশ্বাস করো নি।...হুঁ হুঁ বাবা! আজ হাজার টাকার কম কোন এন্‌গেজমেন্ট নিই না।...অত দুঃখ সহ্য করলে, সত্যি—আর ক'টা বছর যদি কাদায় গুণ ফেলে থাকতে পারতে—আজ আর অন্তত গয়না-কাপড়ের দুঃখ থাকত না। নিজের দুটো ভাতের জন্যেও পরের চাকরি করতে হ'ত না।'

মীরার গলার কাছে কী একটা কিছু ঠেলে ঠেলে উঠছে ?

চোখ দুটো এমন জ্বালা করছে কেন। ঠোঁটের ভঙ্গীটা আপনা থেকেই যেন বিকৃত হয়ে উঠছে! তার কি কান্না পাচ্ছে এতকাল পরে ?

মীরাকে বাঁচিয়ে দিল পরীর মা, পর্দার বাইরে থেকে প্রশ্ন করল, 'ঠাঁই করব নাকি দিদি ?'

কথা কওয়া যায় না—তবু না কইলেও নয়; প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে মীরা জিজ্ঞাসা করল, 'খাবে এখন ? খেতে দেব ?'

'খেতে ? তা দাও! তোমার আবার রাত হয়ে যাচ্ছে! আমার তো রাত্রে খাওয়ার অভ্যাসই চলে গেছে বলতে গেলে। যেদিন বায়না থাকে কোথাও, সেদিন তো খাওয়াই হয় না—অন্য দিনও আড্ডা চুকতে চুকতে রাত দুটো তিনটে বেজে যায়—তখন আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। এই এটা-ওটা—সামান্য কিছু।... আয়োজন তো থাকে সব জায়গাতেই প্রচুর, খায় কে ? আবার যেদিন বোতল চলে সেদিন তো আর কিছুই হয় না—ঐ যা সঙ্গে কাটলেটটা-আসটা!'

'তুমি —তুমি মদ খাও!' যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে মীরা।

'তা—মানে, যে লাইনে যা। বুঝলে না? তবে কি রোজ—তা নয়! এক-আধ দিন। রোজ খাই নে—। এই তো গেল আট-দশ দিনের মধ্যে এক দিনও খাই নি!'

একটু অপ্রতিভ ভাবে, গলায় অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলে শেষের কথাগুলো।

মীরা আর দাঁড়ায় না। খাওয়ার আয়োজন করতে চলে যায়।

ভেতরের বারান্দায় খাবার সাজাতে সাজাতে কানে যায়—শুয়ে শুয়ে কী একটা সুর ভাঁজছে সহদেব। গুনগুন ক'রে—কিন্তু তবু তার মাধুর্য যেন অবশ ক'রে ফেলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে; আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছে মীরা এটাও ঠিক—কিন্তু আর দুটো-তিনটে বছর কেন অপেক্ষা করতে পারল না!

একেই কি নিয়তি বলে?

|| ১৫ ||

খেতে গিয়ে লাফিয়ে ওঠে সহদেব।

'আরে, এসব কী কাণ্ড করেছ! এত কে খাবে! পাগল নাকি তুমি! সে দিন আছে! তাছাড়া ছেলেবেলাতেও আমি কখনও এত খেতে পারতুম না, ভরা পেটে রেওয়াজ করা করা যায় না ব'লে!···বাপ্ রে! এ যে এক-ঘর রান্না। এত ভাজা—ভাজা যে একদম খাই না আমি! এ বাটিতে আবার কি—ধোঁকা? এই গ্যাখো, সকালে জিজ্ঞাসা করলুম—তাই? ধোঁকা, ডালের বড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছি—মানে দিতে হয়েছে। সহ্য হয় না আর। খেলেই পেটে একটা ব্যথা ধরে।'

'একটুও খাবে না? আমি এতকাল পরে নিজে রাঁধলুম—তুমি ভালবাস ব'লে।···তোমার মনের মতো ক'রেই করেছি।'

দারুণ অপমান বোধ হয় যেন। লজ্জায় গলা বুজে আসতে চায়। তবুও আস্তে আস্তে বলে কথাগুলো।

নিজেরই বিশ্বাস হয় না যে এত দীনতা আজও প্রকাশ করতে পারে সে।

'আচ্ছা আচ্ছা, একটু মুখে দিচ্ছি। না হয় গিয়ে ওষুধই খাব। আছে, ব্যথার ওষুধও আছে। কিন্তু সেটা খেলে গলাটা আবার বড্ড জখম ক'রে দেয়—অন্তত দু তিন দিন। তা হোক—তুমি আবার কষ্ট পাবে। না—না, খাব একটু।··· এটা কী গো—চিংড়ী মাছ? এটা কিন্তু বাপু মাপ করতে হবে—এ বস্তুটি আজকাল ছুঁই না পর্যন্ত—দেখলেও ভয় করে। তবে তার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না। তুমি আর কী ক'রে জানবে? সত্যিই তো!···আর দরকারই বা কি! মাংস তো আছে দেখছি। দুখানা তো লুচি খাব!'

সত্যিই যেন পাখির আহার করে সহদেব।

এ-বাটি ও বাটি ঠুকরে-ঠুকরে প্রায় কোনটাই একবারের বেশি খায় না।

কতকগুলো তো ছোঁয়ই না মোটে।

শুধু রাবড়িটাই যা খায় তৃপ্তি ক'রে—যেটা বাজারের কেনা।

'রাবড়ি দেব আর একটু? কিছুই তো খেলে না। যেটা ভাল লাগল সেটাই অন্তত খাও—

'ঐ গ্যাখো পাগল! খেলুম না কি! বিস্তর তো খেয়েছি। বহুদিন পরে এত খেলুম—সত্যি বলছি! রাত্রে খাওয়া যে একেবারে অভ্যেস নেই, একটু খেলেই

কষ্ট হয়। এখন গিয়ে একগাদা ওষুধ খেতে হবে!'

হঠাৎ, অতর্কিতে বেরিয়ে যায় কথাটা, কোন রকম সতর্ক হবার বা আত্ম-সম্বরণের চেষ্টা করবার আগেই—।

হয় তো 'গিয়ে' কথাটা অগ্নিশলাকার মতোই কানের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ ক'রে সব গোলমাল বাধিয়ে দেয়।

আত্মসম্মান জ্ঞান, এতদিনের শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি ছাপিয়ে আদিম নারী কথা কয়ে ওঠে ওর মধ্যে; মীরা বলে ওঠে, কেমন একটা তীক্ষ্ণস্বরেই বলে, 'তুমি—তুমি কি রাত্রে আবার ফিরে যাবে নাকি?'

'ওমা, তা যাব না তো থাকব কোথায়?'

কণ্ঠস্বরে এবং মুখ-ভাবে নির্ভেজাল বিস্ময়।

হয়ত একটু কৌতুক-মিশ্রিতও—ছেলেমানুষের অবাস্তব প্রশ্নে বয়স্কদের মুখে যেমন হাসি ফোটে—তেমনিই!

সহদেব বলে, 'এ-ই ছাখো না, গাড়ি এসে পড়ল বলে। আমি দেখে এসেছি মহাদেবীর সঙ্গে রাণীসাহেবার টাগোফায় চলছে। আমি সাফ বলে দিয়েছি—তোমাদের ঝগড়া তোমরা মিটিয়ে নাও, যার গাড়ি ওখানে যাবে আমি তার গাড়িতেই চড়ব।...মহাদেবী মানে চামারিয়ার স্ত্রী—বড় ভাল মেয়ে, খুবই যত্ন করে—তবে ওর বাড়িটা একেবারে একটেরে হয়ে পড়ে তো—আমার সঙ্গতী-শাগরেদদের বড় অসুবিধে হয়। সেদিক দিয়ে রাজাসাহেবের বাড়িই বেস্ট্। কিন্তু কী করব—সকলেই টানাটানি করে, দু'এক দিন ক'রে গিয়ে থাকতে হয় সকলের কাছেই।'

প্রশ্নটা ক'রে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জায় মরে যাচ্ছিল যেন মীরা। এখন কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গী আনবার চেষ্টা ক'রে বলে, 'তা এমনি ভাবেই কি চিরদিন চলবে? পরের বাড়িতে এমনি ক'রে ভেসে ভেসে বেড়াবে চিরকাল? মানুষের শরীর-গতিক, বলা তো যায় না—তাছাড়া বয়সও হচ্ছে—অসুখ-বিসুখ করে যদি? ঈশ্বর না করুন—যদি দু মাস ছ মাস পড়েই থাকো, তখন?'

অনুযোগের সুর মীরার কণ্ঠে।

হয়ত একটু তীক্ষ্ণই। অভিভাবিকার মতোই।

আপনিই বেরিয়ে আসে ওর গলা থেকে—ওর মনেও পড়ে না যে এ ধরনের অনুযোগ করবার আর কোন অধিকার নেই ওর।

মুহূর্ত কয়েকের জন্য বুঝি গম্ভীর হয় সহদেবের মুখটা, একটু বুঝি স্থির চিন্তার ছাপও পড়ে—আবার পরক্ষণেই যেন জোর ক'রে সরিয়ে দেয় সেটা।

কথাটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে হেসে বলে, 'ভবিষ্যতের ভাবনা তো কোন দিনই ভাবি নি, তা ভাবলে আর তোমাকেই বা হারাব কেন? বাসা তো ছিলই, নিজেই তো ঘুচিয়েছি। না, এখন আর নতুন ক'রে ও ভাবনা ভাবতে পারব না, এ বয়সে আর ওসব অভ্যেসও হবে না। তার চেয়ে এ বেশ আছি। যদি অসুখ করে? যার বাড়িতে অসুখে পড়ব, হয় সে সেবা করবে, নয় তো নিজের গরজেই হাসপাতালে দেবে। আর মরা? মরার বাড়া গাল নেই—মরেই যদি গেলুম তো দেহটা নিয়ে কে কী করলে না করলে তা নিয়ে আমার আদৌ দুশ্চিন্তা নেই। রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ি তো পড়লুম, ডোম আছে মুদ্দফরাশ আছে– আজকাল কী হিন্দু-সৎকার-সমিতিও হয়েছে শুনেছি—আর কারুর বাড়িতে পড়লুম তো দায়িত্ব তার, তাকে লাশ সরাতেই হবে।'

আবারও গলার কাছে কী একটা যেন ডেলা পাকায়: আবারও জ্বালা ক'রে আসে চোখ দুটো, অবাধ্য জল বাধা মানে না। তবুও প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেয় মীরা, হৃদয়াবেগকে শাসন করে।

'কিন্তু—কিন্তু মরবার সময় মানুষ তো আপনার লোককে কাছে চায়, একটু সেবা চায়!'

প্রচণ্ড শব্দ ক'রে হেসে ওঠে সহদেব। যেন এমন তামাশার কথা কখনও শোনে নি সে।

'কিছু না। কিছু না। আপনার লোক ঘিরে থাক বা না থাক—মরবার হ'লে মরবই। কষ্টও কেউ লাঘব করতে পারবে না আমার, ও যত লোকই ঘিরে থাকুক। বরং শুনেছি প্রিয় লোক কেউ পাশে থাকলে ছেড়ে যেতে আরও কষ্টই হয়। · না, ও কিছু নয়। ও ব্যাপারে আমার কোন ভাবনা নেই। মাঝে মাঝে শুধু ভগবানকে জানাই—যেদিন সে বেটার কথা মনে পড়ে—যে, যেন গাইতে গাইতেই মরতে পারি—একটুকু শুধু কোর। গলাটা কেড়ে নিও না কোন দিন।'

॥ ১৬ ॥

খাওয়ার আসনে বসেই এতক্ষণ কথা হচ্ছিল, এবার উঠে পড়ে সহদেব।

যে পরিমাণ বিপুল ভোজ্য পড়ে থাকে—সারাদিনের পরিশ্রম শুধু পরিশ্রম বললেও কম বলা হয়, সাধনার ধন—সেদিকে চেয়ে মীরার চোখে জল এসে যায়।

কিন্তু সহদেবের সে দিকে কোন লক্ষ্যই নেই। এমন কি সে যে খেতে পারল না—এটাও বোধ হয় অনুভব করে না সে। কারণ অন্য দিনের চেয়ে সে বেশীই খেয়েছে। তাছাড়া তাকে খাওয়াবার জন্য এমন ধারা আয়োজন এই প্রথমও নয়—দুর্লভও নয়। আর সে সব-ক্ষেত্রেই এই অবস্থা হয়। এইটুকু খেলেই কৃতার্থ হয় উদ্যোক্তারা। তাই সে যে কোন অবিচার করছে বা আঘাত দিয়েছে এ সম্ভাবনা তার মাথাতেই যায় না, বরং সে খুশী করতে পেরেছে মীরাকে এই কৃতার্থতার আনন্দেই মশগুল হয়ে ওঠে যেন।

কলঘর থেকে আঁচিয়ে এসে আবার বিছানাতে বসে জুৎ ক'রে।

'কৈ গো, পান-টান দাও। পান আনিয়ে রেখেছ তো? একটু জর্দা? না থাকলেও ক্ষতি নেই অবশ্য, তবে পানটা চাই।'

এ ঘর থেকে হেঁকে বলে সহদেব।

ভেতরের বারান্দা দিয়ে পান নিয়ে আসতে আসতে মীরা লক্ষ্য করে, প্রকাণ্ড একটা গাড়ি ঢুকছে ওদের ব্লকের সামনের রাস্তায়। যে গাড়িতে এসেছিল সহদেব সেটা নয়—এটা সাদা রঙের, এবং সম্ভবত আরও বড়।

এতক্ষণ নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে বৈকি মীরা।

সে পান হাতে ক'রে ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমার গাড়ি এসেছে বোধ হয়—।'

'এসেছে? কোন্ গাড়ি? যেটায় এসেছিলুম?'

'না। সাদা রঙের।'

'ও, তা হ'লে মহাদেবীর! মরেছে! এখান থেকে কাছে হবে এই যুক্তিতেই জিতেছে আর কি!...মুশকিল, ওর কাছে গেলে বড় ঝামেলা হয়। এত লোক আসে—এখনই গিয়ে দেখব ত্রিশ জন লোক বসে আছে—ভক্ত! ভক্ত দেখলে আজকাল গায়ে জ্বর আসে।'

'তা না-ই বা গেলে তা হ'লে ওর ওখানে?' মৃদু কণ্ঠে বলে মীরা।

'না গিয়ে উপায় কি বল! বলে এসেছি তোমাদের মধ্যে ঠিক ক'রে নাও—

যে গাড়ি যাবে তাতেই চড়ব। এখন তো আর সে কথা ফেরানো যায় না—! ও হয়ত সেই-মতোই ব্যবস্থা করেছে। এতক্ষণে আমার যন্ত্রপাতি, জামা-কাপড়ের স্যুটকেস, ওষুধের বাক্স সব চলে এসেছে মহাদেবীর এখানে। ওদের সব চট্‌পট কাজ—হাজার হোক ব্যবসাদারের বৌ তো!'

আবারও হা-হা ক'রে হেসে ওঠে সহদেব।

আর সেই হাসির মধ্যেই ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নড়ে ওঠে।

মীরা এগিয়ে যেতে চায়, সহদেব ইঙ্গিতে নিরস্ত করে। ঘর থেকেই হেঁকে প্রশ্ন করে, 'কে—সীরাশরণ ?'

'জী!' উত্তর আসে বাইরে থেকে।

'তুমি বোস গে গাড়িতেই, আমি যাচ্ছি।'

কিন্তু তখনই ওঠে না সহদেব, বরং পাশবালিশটাকে আরও গুছিয়ে ঘাড়ের নিচে দিয়ে হাত-পা মেলে ভাল ক'রে শোয় আর এক বার। খানিকটা পান মুখে থাকতেই আর একটা খিলি পুরে দেয়। তার পর চারিদিকে তাকিয়ে কেমন একটা উৎসুক সতৃষ্ণ কণ্ঠে আর এক বার বলে, 'তোমার এই ঘরটি কিন্তু বেশ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সুন্দর। এমনি ঘরই আমার পছন্দ।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে—খুব আস্তে, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে মীরা বলে, 'তা এই ঘরেই থাকো না। না-ই গেলে আর।'

'কোথায়? তোমার এখানে? তোমার তো এই মোটে একটি ঘর, এইটুকু বিছানা ভরসা। মিছিমিছি তোমাকে অসুবিধায় ফেলা। আর অকারণ এত হাঙ্গামা করার দরকারই বা কি! সেই তো যেতেই হবে—এক রাতের জন্যে মিছে মায়া বাড়ানো!'

একটা প্রচণ্ড হাই তুলে আলিস্যি ভেঙে উঠে বসে সহদেব।

আর সময় নেই। হয়ত এ অবসর আর কখনও কোন দিন মিলবে না জীবনে। এমন নিভৃত অবসর।

মনটা আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে। গলার কাছে ঠেলাঠেলি করতে থাকে।

যে কথাটা বলতে চায় সে—যেটা এই দীর্ঘকাল ধরেই অযুক্ত রয়ে গেছে—যেটা বলার জন্য চেতনার অগোচরে মন মাথা কুটেছে—সেটা হয়ত আর বলাই হবে না কোন দিন!

তবু মনকে বোঝায় মীরা, চুপ ক'রে থাকাই উচিত।

কোন লাভ নেই। শুধু-শুধুই দৈন্য প্রকাশ করা।

বৃথা, বৃথা।

সে মন মরে গেছে। সে জীবন আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

সহদেব ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে চটিটা খোঁজে।

'নাও, এবার খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়, আর কি! তোমার অনেক রাত হয়ে গেল মিছিমিছি। অভ্যেস নেই তো—'

হয় এখনই—নয়ত আর কোনদিন নয়। এই শেষ, শেষ সুযোগ।

অবশেষে বেরিয়ে আসে কথাটা—যে কথাটা বলার জন্য সেই সন্ধ্যা থেকেই চেষ্টা করছে সে। বহুদিন ধরেই অপেক্ষা করছে বুঝি।

যেন একটা প্রবল ধাক্কায় যুক্তি-বুদ্ধির বাধাটা ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে আসে মনের ব্যাকুল বক্তব্যটা—আবেগের রুদ্ধ স্রোতটা।

প্রায় অশ্রুত-কণ্ঠে বলে ফেলে, 'এক রাত কেন—বেশীদিনই থাক না। আমার—আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

'চিরদিন' শব্দটা শেষ মুহূর্তে মুখে আটকে গেল বুঝি। ঐটুকু অভিমান আর ত্যাগ করা গেল না কিছুতেই!

মীরার কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে সহদেব, 'ও হরি! আমি তোমার এখানে বেশীদিন থাকলে—? সে যে কী অবস্থা তা তো তোমার জানা নেই। তাই চট ক'রে বলে ফেললে—কোন অসুবিধা হবে না। আমি থাকা মানে সারা দিন-রাতে হাজারো লোকের ভীড়! শাগরেদ আছে, সঙ্গতী আছে, ভক্ত আছে—পার্টি আছে। যারা দিনরাত ঘিরে থাকে—সেই ক'টা লোকই তো ধরবে না তোমার এ-ঘরে। আর সে বড় ঝামেলা, মুহুর্মুহু চা চাই, সন্ধ্যে থেকে অন্তত কুড়িবার চা হবে—পারবে? না—আমাকে আর জড়াতে যেও না, পেরে উঠবে না। এক দিনে হাঁপিয়ে উঠবে। তার চেয়ে এ বেশ আছ। সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করতে যেও না।'

ঘর থেকে বাইরে এসে তবু একবার থমকে দাঁড়ায় সহদেব। আরও একবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখে। তৃষাতুর একটা দৃষ্টিতে চায় সেদিকে।

নতমুখী মীরার দিকে তাকিয়ে কী ভাবে যেন।

তার পর আস্তে আস্তে, ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'তোমার যদি কখনও কিছু দরকার হয় মীরা…আমাকে জানিও, সঙ্কোচ কোর না। আমার অবিশ্যি কিছুই থাকে না—রোজগার করি দু' হাতে—তেমনি কোথা দিয়ে উড়ে যায় তাও বুঝি না।…তবু তোমাকে কোনদিনই কিছু দিতে পারি নি, সেটা আমার মনে আছে।

তুমি যদি কিছু চাও, যেমন ক'রেই হোক দেব।'

তার পর দরজায় হাত দিয়ে আবার বলে, 'বেশ কাটিয়ে গেলাম কিন্তু—নিরিবিলি থাকা তো ভুলেই গেছি। বেশ লাগল আজকের সন্ধ্যেটা। আর এক দিন, যদি একটু জায়গা-টায়গা করতে পার ঘরে—এসে তোমাকে গান শুনিয়ে যাব। সঙ্গে জনাতিনেক থাকবে অবশ্য, একজন তবলচি, জন-দুই শাগরেদ—এ তো চাই-ই। একজন হারমোনিয়াম আর একজন তানপুরো ধরবে। দুনিয়াসুদ্ধই গান শুনল আমার, শুধু তুমিই শুনলে না—এ আপসোসটা আমার সত্যিই হয় মধ্যে মধ্যে—বিশ্বাস কর। অবশ্য যদি অসুবিধা হয় তো এর পর যেখানে জলসা-টলসা হবে বড়গোছের, সেখানেও যেতে পার—কার্ড পাঠাব।'

মীরার দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলে, কিন্তু—সম্ভবত ওর মাথাটা হেঁট হয়ে থাকায় ছায়া পড়ে বলেই—মুখটা যে ওর শ্বেতপাথরের মতো রক্তশূন্য হয়ে গেছে সেটা নজর করে না। হয়ত নজরে পড়লেও লক্ষ্য করত না।

মীরা যে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল সেটাও তো লক্ষ্য করে না!

কোনদিনই কিছু লক্ষ্য করে নি। কোনদিনই করবে না। তা মীরা জানে।

সবই জানে—তবু যে কেন হাঁটু দুটো এমন ভেঙে আসে, বুকের মধ্যে এমন একটা হিম-হিম অবশ ভাব বোধ করে—সেইটেই বোঝে না।

মীরার তরফ থেকে কোন বিদায় সম্ভাষণের অপেক্ষাও করে না সহদেব। কোন উত্তরেরও না। একটু থেমে আবারও শুধু বলে, 'আচ্ছা তা হ'লে চলি, কেমন? তুমি খাওয়া-দাওয়া সারো গে।'

তার পর দোর খুলে বেরিয়ে যায় সহদেব।

ইতিমধ্যে কেউ বোধ হয় দেখেছিল ওকে—সেই খবরটাই ছড়িয়ে পড়েছে—ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়ির মুখে অপেক্ষা করছে কতকগুলি ছেলেমেয়ে, প্রত্যেকের হাতেই অটোগ্রাফের খাতা।

'ও কি, এখানেও ঐ সব। না না—আজ আর না। আর এক দিন, আর এক দিন হবে।'

বলতে বলতেই দ্রুত নেমে যায় সে। সিঁড়িতে চটির শব্দটা ঘুরে ঘুরে বাজতে থাকে—একটু একটু ক'রে ক্ষীণ হয়ে আসে ক্রমশ।...

একসময় নিচে গাড়িটা ছাড়ার শব্দ হয়। প্রকাণ্ড গাড়িটা কলরব ক'রে বেরিয়ে যায় ওদের হাতা থেকে।

ক্রমে সে শব্দও দূরে মিলিয়ে যায়।

॥ ১৭ ॥

মহাদেবীর বিপুলাকৃতি গাড়িটার পেছনের সীটে আরাম ক'রেই দেহটা এলিয়ে দেয় সহদেব, কিন্তু তবু যেন কিছুতেই অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যটা পায় না।

কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে সে।

ঘুরে ফিরে শোয়, উঠে বসে—আবার এলিয়ে পড়ে।···

ভাল লাগে না কিছুতেই। কিছুতেই যেন আরাম বোধ করে না।

এ আবার কী হ'ল ওর?

বিস্মিত হয়ে নিজেকেই বার বার প্রশ্ন করে সহদেব।

এমন তো কখনও হয় না!

তবে কি খাওয়াটার মধ্যেই কোন গোলমাল ছিল?

কিন্তু না—সাধারণত আজকাল কোথাও গুরুপাক ভোজন করলে সঙ্গে সঙ্গে যেসব দৈহিক অস্বস্তি হতে থাকে, এ তো সেরকম কিছু নয়।

বরং—এখনও পর্যন্ত বুক-জ্বালা করা বা পেটে ব্যথা ধরা—কিছুই শুরু হয় নি।

যত্ন ক'রেই রেঁধেছে মীরা, নিশ্চয় তার শরীর বুঝেই রেঁধেছে। উপকরণ নির্বাচনেও ভুল হবে না তার। সে তো তার রুচি ও শরীরের কথা জানেই।

না—সেখানে কোন গোলমাল হওয়ার কথাও নয়।

তবে? তার কী হ'ল?

বিহ্বল ভাবে ভাবতে ভাবতে একসময় সহদেব আবিষ্কার করে যে অস্বস্তিটা তার মনে—দেহে নয়।

তার মনের মধ্যেই কোথায় একটা কি বড় রকমের গোলমাল বেধেছে।

তবে কি—তবে কি মীরার জন্যেই সে কোন অস্বস্তি অনুভব করছে? মানসিক কোন গ্লানি?

মীরা?

না না, কী ভাবছে সে যা তা!

পাগল নাকি! দূর!

বহুদিনের কথা সে-সব—দূর বিস্মৃতির পারে চলে গেছে সে-সব দিন।

সে গ্লানি, সে লজ্জা, সে আত্মধিক্কার কবে ধুয়ে মুছে গেছে—নতুন নতুন দিগ্বিজয়ের গৌরবে, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দে।

সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে।

জয় করেছে তা। নিজের শক্তিতে অর্জন করেছে।...

প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে তার সম্বন্ধে এতদিন সকলে যা ধারণা করেছে তা সব ভুল, মিথ্যা। সে অপদার্থ, অকর্মণ্য নয়—বরং অনেকের চেয়েই শক্তিমান, কর্মঠ।

এই বিজয়-গৌরবের দীপ্তিতে মিলিয়ে গেছে সে অন্ধকার দিনগুলো।

আর সেদিনের সঙ্গে মীরাও তলিয়ে গেছে কোথায়।

হ্যাঁ—প্রথম যে আঘাতটা অনুভব করেছিল সে—যে ধিক্কার, যে গ্লানি, সে বাইরের কোন কারণে নয়; বাড়ির লোকের বাক্যবান বা অপমানেও নয়—আর কোন কারণেই নয়, মীরার জন্যই শুধু।

মীরা যে তাকে ত্যাগ করবে কোন দিন, তাকে এমন অসহায় ভাবে ফেলে চলে যাবে—সত্যি-সত্যিই চিরকালের মতো ছেড়ে যাবে, তা কোনদিন কল্পনাও করে নি যে!

মীরা আছে, সে থাকবে—তার জন্য চিন্তা করতে হবে না। তার সাফল্যের জন্য যেমন তার দেহটাও থাকা দরকার, তেমনি মীরাও।

মীরা তার শাশ্বত, তার জীবনের ধ্রুব আশ্রয়।

ঠিক এমন ক'রে ভাবে নি হয়ত, ভাবার মতো শিক্ষাদীক্ষাও ছিল না—কিন্তু তবু এমনিভাবেই মনে মনে তাকে আঁকড়ে ধরেছিল, অবলম্বন করেছিল।

আগে সেটাও বোঝে নি। কোন দিনই বোঝে নি।

কোন দিন ভেবেও দেখে নি সে।

ভাববার দরকার হবে তাও জানত না।

মীরা চলে যেতে সেটা প্রথম বুঝল সে।

কতখানি ছায়া তার মাথার ওপর থেকে সরে গেল—কতখানি মাটি গেল পায়ের নীচে থেকে—তা প্রথম অনুভব করল।

মীরাকে যে সে এতটা ভালবেসেছিল, এতটা নির্ভর করেছিল তার ওপর—তাও জানত না।

আদৌ ভালবাসত কিনা তা-ই কোন দিন ভেবে দেখে নি।

দাম্পত্য জীবনের দায়-দায়িত্ব, ভালবাসা, নির্ভরতা—এগুলো তার কাছে অঙ্কশাস্ত্রের মতোই দুরূহ ও দুর্বোধ্য ছিল।

মীরাকে সত্যি-সত্যিই হারাবার পর প্রথম অনুভব করল যে, কখন নিজের

অজ্ঞাতসারেই, সে তার ঐ সহনশীলা শান্ত বৌটিকে ভালবেসেছিল, তার ওপর নির্ভর করতে শিখেছিল।

তার পক্ষেও তাই ভালবাসা সম্ভব হয়েছিল।

মীরা ছিল তার জীবনের অনেকখানি।

সেদিন কেঁদেছিল সহদেব, আকুল হয়ে কেঁদেছিল।

প্রথমটা তো বিশ্বাসই করতে পারে নি।

ভেবেছিল দু'দিনের রাগ দু'দিনে পড়ে যাবে।

প্রধানত ওর কান্না দেখেই যেদিন ওর দাদা ছুটে গিয়েছিলেন মীরাকে ফিরিয়ে আনতে, সেদিন মনে-প্রাণেই আশা করেছিল যে সে ফিরে আসবে।

ওর ওপর কি রাগ ক'রে থাকতে পারে মীরা।

কখনও না।

সে তো জানে সহদেবের তাকে ছাড়া এক দণ্ডও চলে না, জানে সে না থাকলে সহদেব কত অসহায়!

কিন্তু মীরা ফিরল না।

দাদা ফিরে এলেন একা, মাথা হেঁট ক'রে।

অভিসম্পাত দিলেন ওকে—বংশের কুলাঙ্গার বলে, পিতৃ-পিতামহের মাথা হেঁট করেছে বলে।...

সেদিন সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখেছিল সহদেব—সবটা কালো একাকার হয়ে গিয়েছিল ওর চোখের সামনে।

ওর জীবন, ওর ভবিষ্যৎ, সব কিছু।

কিন্তু সে হ'লও তো বহুকালের কথা।

ওর স্বভাবগুণে সে নৈরাশ্যের মনোভাব ঝেড়ে ফেলতে ওর বেশীদিন সময় লাগে নি, দাদা-বৌদির কাছ থেকে পাওয়া অপমানও না। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের ধিক্কারও সহজেই ভুলে গিয়েছিল।

তার পর কবে একটু একটু ক'রে মীরার কথাও ভুলে গেছে।

কখনও-সখনও এক-আধ দিন, কোন এক-আধজন লোকের মুখে খবর পেয়েছে—মীরা একে একে পাস করছে, মীরা মাস্টারী করছে।

কিন্তু সে স্মৃতিও ক্ষণকালের। গানের মজলিশে—রেওয়াজের মধ্যে—অথবা মদের চক্রে—কখনও কী কথা শুনছে তা বেশীক্ষণ মনে ক'রে রাখা সম্ভবও নয়।

মনে পড়ল একেবারে আজ।

তাও খুব সহজে পড়ে নি। রাণীসাহেবার মুখে নামটা শোনবার পর বেশ কয়েক মুহূর্ত ভাবতে হয়েছে তাকে।

অবশ্য কয়েক মুহূর্তই।

তার বেশী সময় লাগে নি বিস্মৃতির পর্দাটা মনের ওপর থেকে ছিঁড়ে ফেলতে।

এবং মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত, বিচিত্র একটা অনুভূতিতে বুকটা মুচড়েও উঠেছে এক মুহূর্তের জন্য।

বিচিত্র সে মোচড়।

সহদেবের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত সে মনোভাব।

সে অনুভূতিতে কিছুকালের জন্য নিজেই বিস্মিত হয়েছে সহদেব।

তার পর অবশ্য সবটাই সহজ হয়ে গেছে।

অন্তত তাই মনে হয়েছে ওর।

সহজ, খুবই সহজ। সহজ ভাবেই কথা কয়েছে, সহজ ভাবেই এসেছে, সহজ ভাবেই বিদায় নিয়েছে।

না, কোন ক্ষোভ, কোন অভিমান, কোন নালিশ নেই তার মীরার সম্বন্ধে।

থাকবেই বা কেন ?

আজ তো সে বুঝেছে যে মীরা সেদিন যা করেছে—বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে তাকে।

না হলে কী-ই বা করত বেচারী !

আর ভালই তো হয়েছে।

তারও হয়েছে—সহদেবেরও।

অত বড় আঘাতটা না পেলে সহদেব হয়ত এতটা সক্রিয় হয়ে উঠত না—এমন প্রাণপণ প্রয়াসে এ বিদ্যাটা এভাবে আয়ত্ত করতে পারত না।

একান্ত ভাবে কিছু করা—এ তো ছিল তার স্বভাবের বাইরে।

মীরাই প্রচণ্ড আঘাতে সেদিন তার স্বভাব পাল্টে দিয়েছিল।

মীরা সুখে থাক, শান্তিতে থাক, নিশ্চিন্ত থাক।

তার এ জীবনের মধ্যে আর মীরার আসা সম্ভব নয় ; কাম্যও নয়। অনেক দুঃখ দিয়েছে সে মীরাকে—আর কেন ?

সহদেবের অভিশপ্ত ছন্নছাড়া জীবনের ঘূর্ণি-হাওয়া যেন কোন দিন না স্পর্শ করে তাকে !

॥ ১৮ ॥

কোথায় যাচ্ছে তারা, এ কোথায় এসে পড়ল ?...হঠাৎ খেয়াল হ'তে সোজা হয়ে উঠে বসে চারিদিকে চায় সহদেব।

গাড়িটা দাঁড়িয়েই আছে এক জায়গায়। কৈ, চলছে না তো!

'কী হয়েছে সীয়াশরণ—গাড়ি চলছে না ?'

'কী একটা য়্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাবুজী—সামনে সব জাম আছে।'

'ব্যাক্ করো না।'

'পিছনেও দেখুন না—বিস্তর গাড়ি জমে গেছে পর পর। ভারী ভারী লরি সব।...এই রাস্তাটায় বেশী রাতে শুধু লরিই যায়। লরি বোঝাই মাল যাচ্ছে কাশী এলাহাবাদ দিল্লী যায় পাঞ্জাব তক্!'

অকারণেই খানিকটা হেসে ওঠে সীয়াশরণ।

মরুক গে! সহদেব আবার আড়াআড়ি ভাবে এলিয়ে বসে।

পা-দুটো তুলে দেয় ওধারের জানলায়।

তার আর তাড়া কি ? যখন হোক গেলেই হবে।

এখন গেলেও তো নিস্তার নেই। মহাদেবী ঠিক কুড়ি-পঁচিশটি ভক্ত যুগিয়ে রেখেছে। তাদের সঙ্গে বসে বসে অর্থহীন বকবকানি চালাতে হবে সেই রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত।

ভাল লাগে না। ভাল লাগছে না কিছুদিন থেকেই।

সেটা অবশ্য আজ যতটা বুঝতে পারছে আগে ততটা বোঝে নি। শুধু একটা ক্লান্তি অনুভব করছে কিছুদিন থেকেই। ক্লান্তি আর বিরক্তি।

এতকাল মনে করেছে যে অতিরিক্ত পরিশ্রমেরই ফল এটা—কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বিশ্রাম নেবার চেষ্টাও করেছে সে দু-একবার! গেছে পুরীতে, গেছে দার্জিলিংও। কিন্তু ঠিক বিশ্রাম পায় নি কোথাও। যেখানে গেছে সেখানেই দল গেছে সঙ্গে, দল জুটে গেছে সেখানেও।

একা একা নিজের মতো কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে।

তার এ ছন্নছাড়া গৃহহীন জীবনে কোথাও কাউকে আশ্রয় না করলে চলে না। নিজের কোন ব্যবস্থাই যে আর নিজের হাতে নেই।

কখনই ছিল না—কিন্তু আগে নিজের লোক ছিল ; মা ছিলেন, মীরা ছিল।

এখন আপনার কেউ নেউ—সবাই পর।

পরকে আশ্রয় করতে গেলেই তার অধীন হ'তে হয় কতকটা।

আর এই যে সব পর—এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুধু তো খ্যাতির খাতিরেই—সম্পর্ক তো তার বৃত্তির সূত্রে।

সুতরাং যশ ও প্রতিষ্ঠার বিড়ম্বনা এড়িয়ে বিশ্রাম করা আর তার পক্ষে সম্ভব হয় না কোনদিনই।

যেমন সম্ভব হয় না কোথাও নিরিবিলি একটু আশ্রয় পাওয়া।

মহাদেবীকে দোষ দিতে চায় না সে।

বড় ভাল মেয়ে মহাদেবী।

ভাল ওরা সবাই, মহাদেবী, রাণীসাহেবা, রাণু ব্যানার্জি, লছমী শ্রীবাস্তব, পারুল মিত্তির—সবাই বড় ভাল। যত্ন ও আদরের ত্রুটি নেই কারুরই। কিন্তু বড় বেশী যেন করে ওরা। অতটা বেশীই আর ভাল লাগছে না।

তার খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে বহু মেয়েই এসেছে তার জীবনে। ঠিক জীবনে না হ'লেও—তার কাছে।

সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, তোষামোদে তাকে জয় করতে চেয়েছে।

মেয়েদের এই একটা বদ রোগ ;

তারা পুরুষকে জয় করতে চায়, নিজস্ব ক'রে নিতে চায়। সর্বময় প্রভুত্ব ও স্বামীত্ব অর্জন ক'রে অপর মেয়ের ওপর টেক্কা দিতে চায়। পুরুষ ওদের কাছে সম্পত্তি মাত্র—সম্পর্ক-নির্বিশেষে ঐ দৃষ্টিতেই দেখে ওরা তাদের।

আর সেইটেই বরদাস্ত হয় না সহদেবের।

বহু মেয়ে ওকে আত্মদান করতে এসেছিল। সহদেব দয়া ক'রে গ্রহণ করলে কৃতার্থ হ'ত তারা। বহু সুশ্রী তরুণী, মুকুলিকা কিশোরী—বহু বিগত-যৌবনা প্রৌঢ়া নারী।

বিখ্যাত লোকের ঘরণী, দেশনেতার দুহিতা, জমিদারের স্ত্রী।

এ অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন সহদেবের। এর আগে সে এমন কল্পনাও করে নি। সে বিস্মিত হয়েছে কিন্তু অভিভূত হয় নি। কৃতার্থও হয় নি।

কোথাও কোথাও যে সামান্য দেওয়া-নেওয়া হয় নি তাও নয়—তবু এটা ভাল লাগে নি সহদেবের।

কখনই লাগে না।

যশস্বী শিল্পী, খ্যাতিমান খেলোয়াড়, বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক—এদের কাছে এই ধরনের কাঙালপনা, এই ধরনের আত্মসমর্পণ আরও বহু দেখেছে সহদেব, দেখছেও নিত্য।

বহু লোকের প্রশংসার পাদপ্রদীপে আসার পর এই ধরনের অনেক মানুষকে দেখল ও। মানব-মনের গভীরে প্রবেশ করার ইচ্ছা বা অভ্যাস ওর কোনদিনই নেই—কিন্তু ইদানীং অনেক কিছুই জেনেছে। জানতে বাধ্য হয়েছে।

ভাল লাগে না এসব ওর, ঘৃণা বোধ হয়।

এ আত্মদানের অর্থ—যশের ভাগ নেওয়া, প্রতিফলিত আলোতে নিজেকে আলোকিত করা -নিজেকে অপরের কাছে মূল্যবান ক'রে তোলা।

অপর মেয়েদের জানানো – অমুক আমার বিজিত, আমার সম্পত্তি। তোমার নয়, আর কারুর নয়।

অবশ্য এই মহাদেবী, এই রাণীসাহেবা, ঐ রাণু ব্যানার্জী—এরা ও শ্রেণীর নয়।

প্রতিভাকে আশ্রয় দেবে, লালন করবে—এই ওদের গৌরব।

এর জন্য অনেক কষ্ট করে, অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করে। অর্থব্যয় করে জলের মতো। হয়ত ওরা ভালও বাসে তাকে। কে জানে!

কিন্তু তবু বড় কৃত্রিমতা, বড় কোলাহল।

ক্লান্ত ও, এই নিত্য বড়মানুষী আতিথেয়তা গ্রহণে।

এইমাত্র যে ঘরটা ছেড়ে এল—যে ছোট অনাড়ম্বর গৃহ, জটিলতা- ও বাহুল্যহীন আশ্রয়—এখন বুঝছে, আজ উপলব্ধি করছে—আসলে ঐ ধরনের একটি বাসার জন্যই ওর মন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে।

অনেক দিন ধরেই। ঠিক বুঝতে পারে নি, মনের মধ্যে আকার ধরে নি চিন্তাটা—তবু সে এই চিন্তাই। ঠিক অমনিই একটি আশ্রয়, নিজস্ব নিভৃত একটি নীড়—যেখানে তার বাইরের জীবনের কোলাহল এসে পৌঁছবে না।

খ্যাতির বিড়ম্বনা এসে প্রাত্যহিক জীবনকে বিরক্তিকর ক'রে তুলবে না।

আর মীরার মতো একটি মেয়ে। ঐ ধরনের একটি সঙ্গিনী, সেবিকা।

যে তার জন্যই তাকে চাইবে, সেবা করবে। তার প্রতিটি অভ্যাস, প্রতিটি প্রিয় বস্তু দীর্ঘকাল মনে ক'রে রাখবে।

তার যশের অংশগ্রহণ করতে নয়, তার সঙ্গে নিজেকে প্রচার করতে নয়।

তার প্রতিভার মূল্যে নিজেকে বিকোতেও নয়।

যে মেয়ে সম্পত্তি বলে ভাববে না তাকে।

আছে কি তেমন মেয়ে? থাকলেও, তার পক্ষে কি আর পাওয়া সম্ভব?

এই বয়সে তার জীবনে কি এমন মেয়ে আর কেউ এসে দাঁড়াতে পারে তার পাশে, তার কাছে? মীরার মতো কোন মেয়ে।

কিন্তু মীরাই তো রয়েছে! ··

অকস্মাৎ সোজা হয়ে বসল সহদেব।

আশ্চর্য! মীরাই তো রয়েছে। এটা এতক্ষণ কেন বুঝতে পারে নি ও? এতক্ষণ কেন কথাটা মাথায় যায় নি?

সে তো নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছিল। ওকে থাকতেই তো বলেছিল।

শুধু আজকের রাত কেন—বেশীদিনের কথাও তো বলেছিল। হয়ত চিরদিনেও আপত্তি ছিল না। হয়ত সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিল, সেই শব্দটাই চেয়েছিল উচ্চারণ করতে—শুধু সঙ্কোচেই বলতে পারে নি।

ছি ছি, বড় ভুল হয়ে গেছে তার, বড়ই ভুল হয়ে গেছে!

ঈপ্সিত বস্তু হাতের কাছেই এগিয়ে এসেছিল—সে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে।

জীবনে দুর্লভ সুযোগ, পরম মুহূর্তটি এসে তার দ্বারে করাঘাত ক'রে ফিরে গেছে। ফিরিয়ে দিয়েছে সে,—নির্বোধের মতো, অন্ধের মতো।

যাবে নাকি এখন?

ফিরে যাবে? আবার গিয়ে দাঁড়াবে সেখানে। মীরার দুয়ারে?

দোষ কি? ভুল হয়ত এখনও সংশোধনের বাইরে যায় নি!

মীরা! মীরা কি কিছু মনে করবে? ফিরিয়ে দেবে তাকে?

না না, তেমন নয় সে।

ওর মনের মধ্যেকার অন্তর-পুরুষ আশ্বাস দিয়ে ওঠে, মীরা তেমন নয়।

মীরা ওকে ত্যাগ করবে না। তাছাড়া সে তো আজও তার স্ত্রী।

সহদেব তাকে ত্যাগ করে নি, অন্য স্ত্রীও গ্রহণ করে নি।

আর মীরাও তো সেই সূত্র, সেই সম্পর্ক ধরেই আজ তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল।

আজও তো সে সব কিছু মনে ক'রে রেখেছে—তার অভ্যাস ও স্বভাবের প্রতিটি খুঁটিনাটি।

কিছুই ভোলে নি সে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যও না।

মীরার চোখে সে সেই প্রশ্রয়ের ছায়া দেখেছে—যে প্রশ্রয় ওকে একদিন নিশ্চিন্ত ও সুখী ক'রে রেখেছিল, একান্ত দারিদ্র্য আর চরম সর্বনাশের মধ্যেও।

॥ ১৯ ॥

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে কখন।

সহদেব মুখ বাড়িয়ে দেখল—হাওড়ার মোড়ে এসে গেছে তারা।

মহাদেবীর বাড়ি এসে পড়ল যে!

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল সহদেব।

'সীয়াশরণ, সীয়াশরণ—গাড়িটা একবার ফেরাতে হবে বাবা—ঐখানেই ফিরে যাব আর একটিবার।'

'ফিরবেন? ঐখানে? যেখান থেকে এলেন?' সীয়াশরণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ—গাড়ি ঘোরাও জল্‌দি। বিশেষ দরকার।'

আগ্রহে ব্যাকুলতায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সহদেব।

যেন মনে হয় যথেষ্ট জোরে চলছে না আজ অত বড় দামী গাড়িটাও।

তার বসে থাকার ভঙ্গীতে যেন মনে হয় সে নিজেই চালাতে চায় গাড়ি।

গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ছুটে ওপরে উঠে আসে সহদেব।

তার আর তর সইছে না।

আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা সম্ভব নয়।

দীর্ঘদিনের ভুল আজ সংশোধন করার সময় এসেছে—এ সুযোগ এ লগ্ন না বয়ে যায়। এতকাল সে এ বিষয়ে এমন অচেতন ছিল কী ক'রে, এই ভেবেই যেন তার অবাক লাগছে।

তার যে বয়স হয়েছে—এ কথাও সে ভুলে যায় সেই মুহূর্তে। সে ছুটো ক'রে ধাপ লাফিয়ে লাফিয়েই বুঝি ওঠে।

কিন্তু মীরার ফ্ল্যাটের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায় আবার। যেন তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠে, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে উত্তীর্ণ হয় সহসা।

নির্জন, নিস্তব্ধ। সম্ভবত মীরা শুয়ে পড়েছে। হয়ত গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

তার কি গরজ এখনও অবধি জেগে থাকার?

হাত-ঘড়িটা দেখল। রাত তো কম হয় নি। বারোটা বেজে গেছে।

ডাকবে? নাম ধরে ডাকবে মীরাকে?

অথবা দরজায় ধাক্কা দেবে নাকি ?

কিন্তু সেই শব্দে হয়ত অপর ফ্ল্যাটের অধিবাসীরাই উঠে পড়বে আগে। আবার সেই জানাজানি, আবার সকলে তাকিয়ে দেখবে হাঁ ক'রে।

সহদেব আবারও ভুল করছে না তো !

সম্ভবত এইটেই ভুল। আগেরটা ভুল ছিল না। আগেই সে ঠিক করেছিল, ঠিক বলেছিল মীরাকে।

খ্যাতিকে বাদ দিয়ে, বাইরের জীবনকে বাদ দিয়ে আর তার কোথাও থাকা সম্ভব নয়।

ঐ ভীড়, ঐ স্তুতি, স্তাবকের দল, এখানেও আসবে। বিড়ম্বিত ক'রে তুলবে তাদের এই নিভৃত নীড়।

উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলবে মীরাকে।

না, শান্তি আর বিশ্রাম তার অদৃষ্টে নেই।

জ্বলে আর জ্বালিয়েই যাবে নিজেকে চিরকাল—থধূপের মতো।

মিছিমিছি কক্ষচ্যুত, কেন্দ্রচ্যুত তার জীবনের অভিশাপ এই শান্ত সুখময় নীড়ে টেনে এনে লাভ কি ?

তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক।

মীরা সুখে থাক। শান্তিতে থাক। তার জীবনকে কণ্টকিত ক'রে লাভ নেই।

বরং কোন কোন দিন—যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়বে, যখন প্রাণ আকুলি-বিকুলি করবে একটু নিভৃত নির্জনতার জন্য—তখন ছুটে চলে আসবে এখানে, আজকের মতো।

এটুকু সান্ত্বনা ও আশ্বাস থাক না।

আগেকার দিন হ'লে, ওর সেই প্রথম যৌবনের অবুঝ ও আত্মকেন্দ্রিক দিনগুলি হ'লে—এসব কথা ভাবত না হয়ত। কিন্তু এখন যে অনেক দেখেছে সহদেব, জীবন তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এই বিবেচনাটুকুও সেই বহুদর্শিতার ফল।

বিবেচনা না থাকলে মানুষ যে সুখে থাকে তার প্রমাণ সহদেব নিজেই—কিন্তু এখন, এখন আর সেই মধুর অজ্ঞতার দিনগুলি নেই।

আজ সে জীবনের লাভ-লোকসান কিছু কিছু বুঝতে শিখেছে।

অনেক ক্ষতি হয়েছে তার আর মীরার—দু'জনেরই। আবারও নতুন ক'রে ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করবে না সে।

সহদেব আবার নেমে যায়। এবার ধীরে ধীরে, পা টেনে টেনে নামে—যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

নেমে যায় তার শান্তি ও বিশ্রামের আশাকে পিছনে ফেলে রেখে; তার কোলাহলময় অশান্ত বহির্জীবন তথা কর্মজীবনের মধ্যে।

সে জানতেও পারল না, পারবেও না কোন দিন—কল্পনাও করতে পারবে না যে দোরের ওপাশে, সে চলে যাওয়ার সময় থেকেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মীরা—এখনও পর্যন্ত।

শুধু যদি অতি সামান্য একটিও টোকা দিত দোরে, শুধু যদি খুব মৃদুকণ্ঠে ডাকত মীরার নাম ধরে—তা হ'লেই ঐ কপাট খুলে যেত তার সামনে, অবারিত হ'ত শান্তি ও সুখস্বর্গের প্রবেশপথ।

সেই থেকে একভাবেই দাঁড়িয়ে আছে মীরা—সেইখানেই।

শুধু কোনমতে একবার প্রায়-অবশ ও অনড় হাতটা টেনে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল—অটোগ্রাফের জন্য যারা ভীড় ক'রে এসেছিল, তারা কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে ওর দিকে—এইটে অনুভব ক'রেই।

কিন্তু কপাটটা বন্ধ করবার পর আর কিছুই করতে পারে নি সে। জড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

তারই মধ্যে নিঃশব্দে কখন অশ্রু নেমেছে ওর চোখে, ধারায় ধারায় সে জল গড়িয়ে পড়ে ওর বুকের বসন ভিজিয়ে দিচ্ছে সেই থেকে। তাও বোধ করি সে বুঝতে পারে নি।

পরীর মা বহুবার এসেছিল তাকে ডাকতে, কিন্তু ওর ঐ স্তম্ভিত ভাব দেখে কে জানে কেন ডাকে নি। ডাকতে পারে নি।

বোধ হয় কোন অজ্ঞাত এক আশঙ্কায় সাহস করে নি।

কি ভেবেছে কে জানে। হয়ত খানিকটা সত্যই অনুমান ক'রে থাকবে।

রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করেছে ওর ধ্যান ভাঙার। তার পর একসময় সে-ও অভুক্ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে আছে মীরা, আরও দীর্ঘকাল থাকবে।

হয়ত প্রভাতের আগে তার এ ধ্যান ভাঙবে না।

সে জানতেও পারল না—বোধ হয় কোন দিনই পারবে না—সহদেব তার কাছেই একটু আশ্রয়ের জন্য ফিরে এসেছিল আবার, কিন্তু ডাকতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত ফিরেই গেছে।